রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

প্রবোধ চন্দ্র সেন

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পারিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

বিশ্বভারতীর

প্রাকৃতন কৃতী ছাত্র ও বর্তমান উপাচার্য

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্য বই :

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

ধর্মবিজয়ী অশোক

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত

India's National Anthem

ধম্মপদ-পরিচয়

বাংলার ইতিহাস-সাধনা

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ (যন্ত্রস্থ)

অধ্যায়ানুক্রম

প্রবন্ধ পরিচয়

প্রবন্ধগুলির কালানুক্রমিক প্রকাশ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। যে-সব স্থলে নাম পরিবর্তিত হয়েছে সে-সব স্থলে মূল নাম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

শিক্ষার লক্ষ্য (এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো): দেশ, ১৩৫৮ শারদীয় সংখ্যা

শিক্ষা-সমস্যা: দেশ, ১৩৫৮ কার্তিক ১৬

বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়: দেশ, ১৩৫৯ ভাদ্র ২৮, আশ্বিন ৪, ১১

সাহিত্যের মুক্তি: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ, —বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির, ১৩৫৯ চৈত্র ৭: দেশ, ১৩৫৯ চৈত্র ২৮

শিক্ষার মুক্তি: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৫৫ জানুয়ারি ২৬

ভাষার মুক্তি: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২ মাঘ ১২

বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ (বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী): দেশ, ১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ ১

এই গ্রন্থে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর পত্রখানি বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে।

লেখকের বক্তব্য

উনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলা দেশে যে অভ্যুদয় ঘটেছে তার মূলে আছে নবশিক্ষার উদ্‌বোধন ও বাংলা সাহিত্যের নব-উদ্যম। এই দুই-এর সমন্বয়েই বাঙালিচিত্তের উজ্জীবন। কিন্তু এই সমন্বয়ও আজও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। ফলে বাঙালিচিত্তের উজ্জীবনও অর্ধপথেই স্তব্ধ হয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। যদি তাই হয় তবে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। যে শিক্ষা-ও-সাহিত্য-সমন্বয়ের পরশপাথরের স্পর্শে আমাদের জীবনের একাংশমাত্র সোনা হয়ে উঠেছে, সেই পরশপাথরটিকে যদি আমরা অজ্ঞাতে বা অবহেলায় অস্বীকার করি, তবে অসমাপ্ত অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবেই বাঙালির নাম ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

বাকি অর্ধ-ভগ্ন প্রাণ
আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

—এই করুণ কাহিনীই কি আমাদের পক্ষে সত্য হয়ে থাকবে?

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনস্বী পুরুষই বাংলাদেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের সমন্বয় সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক কালে তাঁদের মধ্যে অগ্রস্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ। বিংশশতকে বাঙালিচিত্তের পরিপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই দুইজন। কিন্তু তাঁদের আরব্ধ ব্রতের সমাপ্তি সাধনের কোনো প্রয়াস বাংলাদেশে আজ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের আরব্ধ কর্মকে সমাপ্তিদান আমাদের অবশ্য সম্পাদনীয় দায়িত্ব। তাই মনে করি আমাদের শিক্ষানায়কদের চিন্তা ও কর্মধারার কথা নূতন করে স্মরণ

করবার দিন এসেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কিছু পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। জাতীয় চিত্তোদ্‌-বোধনের প্রেরণাস্থল হিসাবে শিক্ষার যে সার্থকতা, আমি প্রধানতঃ সে দিক্‌টিকেই আমার আলোচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি। তারও মূলে রয়েছে শিক্ষার সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের যোগের প্রশ্ন। শিক্ষার বাহন-সমস্যার কথা আমাদের চিন্তানায়কদের মনে দেখা দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহু পূর্ব থেকে। তারপর অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে তাঁরা এই সমস্যাকে বারবার দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন ও তার সমাধানের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। শিক্ষার বাহন-সমস্যাকে তাঁরা এত যে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার কারণ আমাদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে এই সমস্যা। আমাদের শিক্ষাসৌধ যতদিন না জাতীয় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন তা স্থায়িত্বও পাবে না, জাতীয় জীবনের অধিষ্ঠানরূপেও পরিগণিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ এই মূল সমস্যাটির প্রতি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তথাপি আজ পর্যন্তও যদি আমাদের শিক্ষানায়কদের কর্মধারা রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত না হয়ে থাকে, তবু বিচলিত হবার কারণ নেই। কারণ কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। মনস্বীদের সত্যচিন্তা কখনও নিষ্ফল হয়না। কালক্রমে কোথাও না কোথাও সে চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হবেই। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে লক্ষ্য করেছি পূর্ব বাংলার 'বাংলা-আকাদামী'র উদ্যোগে সেখানকার মনস্বী শিক্ষানায়কেরা একটি 'বাংলা-কলেজ' প্রতিষ্ঠার ও কালক্রমে সেটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হক্‌ এই কামনাই করব এবং আশা করব, 'ইতিহাসের

একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে'। আরও আশা করব পূর্ব বাংলার বাঙালিচিত্তের এই উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ একদিন বাংলার এই পশ্চিম দিগন্তকেও আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আশা ও উৎসাহেব বাণী নতুন করে স্মরণ করি।—

আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্‌ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।···বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত। নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশেব পক্ষে হয়নি। য়ুরোপীয সভ্যতাব দীক্ষা জাপানের মতো আমাদেব পক্ষে অবাধ নয; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। য়ুরোপীয শিক্ষা আমাদেব দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক্‌ থেকেই তা সম্পূর্ণ আযত্ত করত। আজ নানা দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হযে উঠছে, তবু বিশ্ববিদ্যালযের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুড়ি করে মরছে। বস্তুতঃ, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেযে বাংলাদেশে যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি।···

একথা ভুললে চলবে না, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে। —জাপান যাত্রী, ১৫

আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কি ও স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত বাঙালির দাযিত্ব কি, তা অকুণ্ঠকণ্ঠে ধ্বনিত হযেছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে। আশা করব পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলা একদিন মাতৃভাষার যোগে

মুক্তশিক্ষার পথে অগ্রসর হয়ে উক্ত সিংহদ্বার উদ্ঘাটনের দায়িত্বভার পূর্ণশক্তিতেই গ্রহণ করবে।

এইদিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি রচিত। শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। জাতীয় চিত্তের প্রাণশক্তি নির্ভর করে এই তিনের মুক্ত প্রকাশের উপরে। এই ত্রিবিধ মুক্তির যোগে কি ভাবে জাতীয় জীবন নবশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র অবলম্বনে তাই হচ্ছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা, বিশেষতঃ তার বাহনসমস্যা, সর্বভারতীয় শিক্ষানায়কদের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে প্রবল ভাবেই। এক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ কর্তব্য বা দায়িত্ব কি, আমাদের মনীষীরা কোন্ দিকে পথনির্দেশ করেছেন, এই পুস্তকে পরোক্ষভাবে তারও আভাস দিতে প্রয়াসী হয়েছি। এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়গুলি কালোপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচনা বিষয়োপযোগী হয়েছে কি না তার বিচারের ভার পাঠক-সমাজের উপরে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আলোকে এইসব সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়কে যদি কিছু মাত্রও পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়ে থাকি এবং পাঠকসমাজ যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব-উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি পর্ণমাত্র রূপে গ্রহণ করেন, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ উপলক্ষ্যে কোনো কোনো লেখা অংশতঃ পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও হয়তো কিছু কিছু পুনরুক্তি ও অন্যবিধ ত্রুটি লক্ষিত হবে। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যদি যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তবে আশা করি এসব ত্রুটি অমার্জনীয় বলে গণ্য হবে না।

স্বীকৃতি

পরম আনন্দ ও গর্বের সহিত প্রথমেই উল্লেখ করব আমার পুত্রপ্রতিম প্রাক্তন ছাত্র অশেষস্নেহভাজন শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দে-র নাম। তিনি নিজে সুলেখক। তাঁর এই সাহিত্যপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্লভ কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মনৈপুণ্য। এই পুস্তকের প্রকাশন ব্যাপারে তার এই নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পরম আগ্রহ সহকারে লেখকের পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত আনুষঙ্গিক দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে এ সময়ে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভবপর হতনা। শুধু পুস্তক রচনার কর্তৃত্বটুকু বাদে এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্য সমস্ত কর্তৃত্বই তাঁর। অপরিসীম প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি এই কাজ কৃতিত্বের সহিত সুসম্পন্ন করেছেন। এমন সহযোগিতা লাভের সৌভাগ্য লেখকের অদৃষ্টে কমই ঘটে। সেজন্য আমি গর্বিত। এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো অবকাশই তিনি রাখেন নি। তাই গর্বপ্রকাশ করেই নিরস্ত হতে হল।

অতঃপর আমার সহৃদয় বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ করব। তাঁরই সাগ্রহ উৎসাহে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রণোদিত হই। তিনি নিজেই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়াতে প্রকাশ কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। এই সময়ে তাঁরও সহায়তায় অগ্রসর হয়ে আসেন শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দে। তাঁদের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয় হয়ে রইল। ৩০ চৈত্র, ১৩৬৭

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়

১

'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।'

এই ছিল দেশের শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের শেষ কামনা (১৯৩৬)। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত সমস্ত বিভাগেই সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিষয়েই শিক্ষার একমাত্র বাহন হবে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা, তাকেই তিনি বলেছেন 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়'। কামনা তিনি করেছেন সমস্ত হৃদয় দিয়েই, কিন্তু মনে মনে জানতেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর একান্ত-আকাঙ্ক্ষিত এই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে, "বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না"। কারণ অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে আমরা যতদিন বাধ্য থাকব, "ততদিন ইংরেজি ভাষায় পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়া বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, একথা মনে

করতে সাহস হবে না”। তবু তিনি বিশ্বাস করতেন, একদিন দেশে তাঁর অভীষ্ট ওই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করবার অভিপ্রায়েই তিনি দেশের শিক্ষানায়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছেন, শিক্ষাকে মাতৃভাষার বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তিনি যেসব আবেগভরা আবেদন জানিয়ে গেছেন, নানা উপলক্ষ্যে সেগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করবার সময় আজ এসেছে।—

“বাংলা যার ভাষা, সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি,···মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্তপথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।”

“এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল, তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।”

“অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন —পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ্ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।”

পরম দুঃখের বিষয় এই যে, অধীনতার ধূমমলিন নিশীথ-প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাবার পরেও রবীন্দ্রনাথের এই উৎকণ্ঠিত বেদনাময় আবেদনগুলি আজ পর্যন্তও দেশের শিক্ষানায়কদের কাছে অনবহিতই রয়ে গেল ; দেশের শিক্ষাস্রোতকে বাংলা ভাষার খাত দিয়ে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলবার জন্যে কোনো ভগীরথের আবির্ভাব ঘটল না। রবীন্দ্রনাথ জানতেন—বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যার বাহনরূপে স্বীকারের এই যে আদর্শ, তা কেজো লোকদের কাছে গ্রাহ্য হবে না, কবিকল্পনা বলেই উপেক্ষিত হবে। তথাপি তিনি বলেছেন, "তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে"। আজ প্রায় চোদ্দ বছর হল বিদেশী রাজশাসনের অবসান ঘটেছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাষাশাসনের অবসান ঘটবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেননা, স্বদেশে স্বভাষাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে তার একান্ত অভাব। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির আয়োজনও দেখা যাচ্ছে না, সর্বত্রই ঊষরতার একাধিপত্য। কিন্তু তা বলে তো নিরস্ত হওয়া চলে না। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথকেও দেশের কাছে বহুবার আবেদন জানাতে হয়েছে শিক্ষাকে মাতৃভাষার স্বাভাবিক আশ্রয়ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। তাঁর অন্যতম শেষ আবেদন এই—

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্ববজনস্বীকৃত

নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম ; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর এই বহু-আবৃত্ত আবেদন ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে শ্রাব্য বলে গণ্য হয়নি। তাই তাঁর আশাকে ভরসা করে শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্কে তাঁরই উক্তির পুনরাবৃত্তি করবার ভার নিতে হল।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। অর্থাৎ, মাতৃভাষার যোগে যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই স্বাভাবিক এবং তাতেই শিক্ষার্থীর মন স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করে। অন্য ভাষার যোগে যে শিক্ষা, তা অস্বাভাবিক এবং তাতে শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভের অন্তরায় ঘটে। এই সত্যের প্রমাণ আমাদের দেশে যত পাওয়া যাবে, তেমন বোধ করি আর কোথাও যাবে না। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই উদ্‌ধৃত করি। তিনি বলছেন,— "শিক্ষার সাধনাকে পর-ভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয় বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারিনে বলে তুলনা করতে পারিনে"। ইংরেজিশিক্ষার 'মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহর' এবং 'বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন'ই আজও দেশের উপরে আধিপত্য

করছে। তাই শুধু শিক্ষা কেন, অন্য কোনো ক্ষেত্রেই মোহমুক্ত পূর্ণাবয়ব মনের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটতে পারল না। সুখের বিষয়, দীর্ঘকালীন ইংরেজরাজত্বের মধ্যে অন্ততঃ একটি মন ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রে মোহগ্রস্ত এবং বিদেশী ভাষার চাপে বামন হয়ে থাকার চরম দুর্ভাগ্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। সে মন রবীন্দ্রনাথের। সুতরাং মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে বাঙালির মন কি হতে পারত, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কথাই উল্লেখ করা যায়। অতএব তিনি মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং সে শিক্ষার যা ফল হয়েছিল, তার আলোচনার সার্থকতা আছে। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বাল্যশিক্ষার কথা সানন্দে ও সগর্বে বিবৃত করে গেছেন।—

ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারকরসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুই পাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে।···অবশেষে বহু কষ্টে অনেক-দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে, তখন ক্ষুধাটাই মরিয়া যায়। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া

গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

—জীবনস্মৃতি, বাংলাশিক্ষার অবসান

এই জীবনস্মৃতি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম ইংরেজি-শিক্ষার অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইংরেজির গৃহশিক্ষক ছিলেন অঘোরবাবু। এ সম্পর্কে তিনি বলছেন—

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।···বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে, আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, গদ্য কি পদ্য বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্‌ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে, সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল।···প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনো মতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স্ কোর্স অব রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল।···বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না।···প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের দেউড়িতেই থাকে থাকে সার-বাঁধা সিলেবল্‌-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্‌সেণ্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি

ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

—জীবনস্মৃতি, নানা বিদ্যার আয়োজন

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ইস্কুলেও কিছুকাল পড়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় কিছুতেই তাঁর মন বসেনি। ফলে 'ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক'। তবু যে তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি, তাঁর মনোবিকাশের অন্তরায় ঘটেনি, তার কারণ বালক-বয়সে তিনি দীর্ঘকাল মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন; বিদেশী ভাষার চাপে তাঁর মন বামন হয়ে যায়নি। পরভাষার কঠিন বেষ্টনীর বাইরে মাতৃভাষার মুক্ত হাওয়ায় শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ দিলে বাঙালির মনের কতখানি বিকাশ ঘটতে পারে, তার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল রবীন্দ্রনাথ। তাই একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সারাজীবন মাতৃভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন করবার ব্যর্থ আবেদন জানিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের জীবনে বাংলা শিক্ষার প্রভাব কতখানি, সে বিষয়ে তাঁর উক্তিই স্মরণীয়।—

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে-শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি, তার মূলে তাছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনও যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জ,স্তিত,...তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল

সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চপদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ ছাত্রবৃত্তি পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সংগতি ছিল নর্মাল স্কুল নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়।···আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভরতি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত-বিজ্ঞান।···এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজিবর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।···এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশু-মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি।···ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভরতি হয়েছিলুম।··· নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি, মাতৃভাষায় রচনায় অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তারপরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।··· ইস্কুলপালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি, সেটুকু আমি নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি ; তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে

বাংলা ভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।...আমার ইংরেজি শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্রসমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে।...তার কারণ শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায় ; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে-খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর যাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

রবীন্দ্রনাথের নিজ শিক্ষা-অভিজ্ঞতার কথা একটু বিস্তৃত-ভাবেই উদ্ধৃত করা গেল। কেননা, এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে শিক্ষণীয়তা আছে, সে কথা আজ আমাদের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুসরণীয়।

যা হক, রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে যে আদর্শের কথা বার বার দেশের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, এবার তাই একটু সংহত আকারে গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করব। তৎপূর্বে বলা প্রয়োজন যে, বাংলাসাহিত্যের নবযুগের যিনি প্রবর্তক সেই পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যাভিমানী মধুসূদনও শেষ বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষায় মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য স্থান না দেবার কুফল কতখানি। নিজের অল্পবয়সের শিক্ষায় মাতৃভাষাচর্চার অভাবের জন্য তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue...Our Bengali is a very beautiful

language, it only wants men of genius to polish it. Such of us, as owing to early defective education know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong.

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে উচ্চারিত মধুসূদনের এই শেষ উক্তিটি আজও আমাদের বহু শিক্ষাভিমানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সমভাবেই প্রযোজ্য, আজও তাঁদের ইংরেজিশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে এই উক্তিটি অশ্রাব্য বলেই গণ্য হবে। মধুসূদন তথা বঙ্কিমচন্দ্রকেও ঠেকেই শিখতে হয়েছিল যে, মাতৃভাষাই ভাবগ্রহণ (অর্থাৎ শিক্ষা) এবং ভাবপ্রকাশের (অর্থাৎ সৃষ্টির) মুখ্যতম উপায়। তাঁদের এই ঠেকে-শেখার কথাও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে তুলে ধরতে ভোলেননি।—

বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাতলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ঠেকে-শেখার বিড়ম্বনা তাঁদের আমলেই চুকিয়ে দিয়ে আমাদের পক্ষে কি দেখে-শেখার সময় এখনও এল না? মধুসূদন আক্ষেপ করে গেছেন নিজের 'defective education'-এর জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ আনন্দ-বোধ করে গেছেন নিজের সার্থক শিক্ষার জন্য। একজন তাঁর ব্যর্থতা এবং আর একজন তাঁর সার্থকতার দ্বারা আমাদের একই বিষয় উপলব্ধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেটি এই যে, মাতৃভাষাকে সর্বতোভাবেই শিক্ষার উপায় এবং আধার বলে স্বীকার করতে হবে।

২

১৮৮৩ সালে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠারও পূর্বে, যখন দেশে সবেমাত্র জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে, জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—

বিদ্যাশিক্ষার প্রচার···যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলে এইটি হয় না। ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলাসাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায়

ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।

—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক, পৃ ২৯৩

বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার এবং বাংলা-সাহিত্যের যোগে সেই শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র বিস্তার, এই ছিল শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংকল্প ও সাধনা। ইংরেজি ভাষার যোগে যে নববিদ্যা দেশে প্রবেশ করেছে, তাকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে 'বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' ছিল তাঁর আর-এক লক্ষ্য। মনন-সাহিত্যের অভাবে এবং কাব্য নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতি রস-সাহিত্যের অতিচর্চার প্রভাবে বাঙালির মন দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে, তিনি বার বার এ দুঃখ করে গেছেন। বাংলা-সাহিত্য তথা বাঙালিমনের একাঙ্গীনতা তাঁকে কতখানি পীড়া দিত, তার প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্র। বাংলাসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সে সাহিত্যের যোগে দেশের সর্বস্তরে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার বিকিরণ, এই লক্ষ্যের দিকেই তিনি জীবনব্যাপী সাধনাকে পরিচালিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই আদর্শের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাই ১৮৮৩ সালেই যখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। এর দশ বছর পরে তিনি এই আদর্শের কথাই আরও বিশদভাবে এবং আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন তিনটি প্রবন্ধে। তিনটিই প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়, 'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯ পৌষ) ও 'প্রসঙ্গকথা' (১২৯৯ চৈত্র এবং ১৩০০ আষাঢ়) নামে। প্রথম প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন,—"বাঙালির ছেলের মতো এমন

হতভাগ্য আর কেহ নাই"। কেননা, আমাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হল ইংরেজি, এই বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে করতেই আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হয়ে যায়; যখন ওই বিদেশী ভাষা আয়ত্তে আসে, তখন আর যথার্থ শিক্ষালাভের সময় থাকে না। ফলে আমাদের ভাষা ভাব ও আচরণের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সমন্বয় থাকে না। আমাদের শিক্ষা ও জীবনযাপনপদ্ধতি পরস্পরকে খণ্ডন ও বিদ্রূপ করতে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন—

শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।

—সাধনা, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ১০৭

শিক্ষাকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ভিত্তির উপরে স্থাপন করার কথা অপর দুটি প্রবন্ধে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পড়ে তৎকালীন তিনজন মনস্বী রবীন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করে তাঁকে তিনখানি পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ পত্র তিনখানি আংশিকভাবে উদ্ধৃত করে পরবর্তী প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশদতর আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন,—"প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া

কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।” কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তিদের ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে শ্রাব্য বলে গণ্য হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য (১৮৯০-৯২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, উক্ত প্রবন্ধের “প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।”—

Calcutta University Minutes for 1891-92, pp. 56-58.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শুধু যে বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিরাশ করেছিলেন তা নয়, আনন্দ-মোহন বসুকেও হতাশ করেছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পড়ে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

“আপনি এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতেই আমারও সেই মত।···বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি, তখনই আমাদের স্বদেশীদের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের পাবলিক ওপিনিয়ন অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এসম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে পর্যন্ত

এই পরিবর্তন সাধিত না হয়, কিছু করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি।”

এই তিনখানি পত্র উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষার কেল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।—

স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, একথা কে না বোঝে?··· দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে; কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে, তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশ্ব ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্‌বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে। ভালরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্‌বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই.

অতঃপর ওই প্রবন্ধেই তিনি শিক্ষার ব্যাবহারিক দিক্ নিয়েও সংক্ষেপে নিজের মত ব্যক্ত করেন।—

বাল্যকাল হইতেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্পে অল্পে; তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়।···শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম, তবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত, তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারে।

শিখিবার প্রণালীই যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২-৫৩

এই শেষ অনুচ্ছেদের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাজাত এবং উক্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। নিজের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

কথা তিনি স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন তিন মাস পরে রচিত অপর একটি প্রবন্ধে।—

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং··· ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অতএব দায়ে পড়িয়া 'আমাদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

—সাধনা, ১৩০০ আষাঢ, পৃ ১৯৬-৯৭

নিজের এই অভিজ্ঞতার কথা, অর্থাৎ বিদেশী ভাষার পীড়নহীন শুধু বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের কথা এবং মাতৃ-ভাষাকে সুচারুরূপে আয়ত্ত করার ফলে তাঁর বাল্যকালে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি খাদ্যাভাবে অপুষ্ট ও অপরিণত না থাকার কথা, পরবর্তী কালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯১২) এবং 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৭) আরও বিশদভাবেই বর্ণনা

করেছেন। সে বর্ণনা পূর্বেই উদ্‌ধৃত করেছি। যা হক, সাধনা পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান ও ইংরেজি-প্রাধান্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়িত্বের সম্বন্ধে যা বলেন, তাও এস্থলে উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।···আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

—সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়, পৃ ১৯৭

৩

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যর্থতার কারণ তার শিক্ষার অবলম্বন বিদেশী ইংরেজি ভাষা, মাতৃভাষার ধ্রুব আশ্রয়ভূমির উপরে তার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে,—ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষা, যাকে বলা হয় ইংরেজি শিক্ষা, সে শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধতা ছিল না।

বরং সেই ইংরেজি শিক্ষাকে দেশের অন্তরে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। "ইংরেজি শিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ীরূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে", সে ইচ্ছা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, "ইংরেজি শিক্ষা বাংলা ভাষার মধ্যে যে পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান্ হইবার সম্ভাবনা"। বস্তুতঃ ইংরেজি শিক্ষাকে মাতৃভাষার যোগে দেশের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত করে দেওয়াই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। মাতৃভাষাই হচ্ছে জাতির রক্তস্রোত; শিক্ষাকে সেই স্রোতোধারার সঙ্গে মিশ্রিত হবার অবকাশ না দিয়ে যদি ইংরেজি ভাষার কঠিন আবরণের মধ্যেই বন্ধ করে রাখা যায়, তবে সে শিক্ষায় জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র-গুরুদাস-আনন্দমোহন-প্রমুখ আরও অনেকেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ ইংরেজি ভাষার দুর্ভেদ্য অন্তরায় আমাদের শিক্ষাকে কতখানি ব্যর্থ করে দেয়, তা উপলব্ধি না করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, তেমন কঠোরতা আর কখনও কারও ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর মতে, উক্ত কর্তৃপক্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা 'অসংখ্য বালক-বলিদান-রূপ মহাপুণ্যে'র অধিকারী; বলা বাহুল্য, এই মহাপুণ্যকর্মের যূপকাষ্ঠ হচ্ছে ইংরেজি ভাষা।

এই সময়ে শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে দেশে যে সামান্য আন্দোলন দেখা দেয়, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল 'সাধনা' পত্রিকা। রবীন্দ্র-রচিত প্রবন্ধগুলির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এসময়ে সাধনায় 'শিক্ষাপ্রণালী' (১২৯৯) এবং 'ইংরাজি বনাম বাংলা' (১২৯৯ চৈত্র) নামে দুটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধে সুবিখ্যাত ইংরেজিসাহিত্য-রসিক লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করেন, আজও তাব উপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে তিনি বলেন—

ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ভাষা শিক্ষা হইবার অগ্রে সেই ভাষায় অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে, না হয় ভাষাশিক্ষা, না হয় বিষয়শিক্ষা। তা ছাড়া প্রথমে কতকটা মানসিক অনুশীলন হইলে ভাষা শিক্ষা করাটাও সহজ হইয়া আসে। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত সমস্ত বিষয় বাংলায় শিক্ষা দিয়া তৎপরে যদি দুই বৎসর ইংরাজিটা খালি ভাষাস্বরূপে শিখান হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, এখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে যতটা ইংরাজি শিক্ষা হয় তদপেক্ষা বেশি হইবারই সম্ভাবনা। যদি নিতান্ত মনে হয় যে, দুই বৎসরে অতটা ইংরাজি শিখান দুষ্কর, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজিটা খালি ভাষাস্বরূপে পড়ান যাইতে পারে। ইংরাজি ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিবার কিম্বা পরীক্ষা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৬

লোকেন্দ্রনাথের এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ সাধনাতেই (১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২-৫৩) লিখলেন—

"শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পারপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।"

অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল যে তিনি নিজেই সে কথা রবীন্দ্রনাথ পরে সাধনা পত্রিকাতেই (১৩০০ আষাঢ়) খুলে বলেছেন। তাঁর সে উক্তি পূর্বেই উদ্‌ধৃত হয়েছে। যা হক, লোকেন্দ্রনাথের মন্তব্যের অনুমোদন করে তিনি আরও লিখলেন—

বাল্যকাল হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক, কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরাজিকে কেবল ভাষাশিক্ষারূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরাজি শিখিবার আরও সময় অধিক পাওয়া যায়।···শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরাজি ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইত।

—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫৩

রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের অনুমোদিত এই শিক্ষাপ্রণালা প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের ইস্কুলগুলিতে প্রবর্তিত হয়েছে। পরে দেখব রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরেও প্রবর্তন করবার জন্যে বারবার ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন। কিন্তু ইস্কুলশিক্ষার স্তরেও এই দুইজন এমন আরও দু-একটি প্রণালীর কথা বলেছেন যার সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই অথচ যা আজও আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবর্তনযোগ্য বলে স্বীকৃত হল না। ইংরাজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য লোকেন্দ্রনাথ লিখলেন—

ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্সট্‌বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্সট্‌বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্সট্‌বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও নোট মুখস্থ হয়। ভাষাজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, ছাত্র সে ভাষায় কেমন লিখিতে পারে, বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। টেক্সট্‌বুক পরীক্ষায় ইহার কিছুই হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী, প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্সট্‌বুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।

—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৭

এই দুইটি প্রধান দোষের একটি দীর্ঘকাল পরে আমাদের

ইস্কুল থেকে দূর হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি দূর হওয়া দূরে থাকুক, প্রথম দোষটি অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি টেক্সট্‌বুকের প্রতাপ বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়ে প্রথম দোষ নিরসনের উপকারটুকুকেও অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীমাত্রেই এ কথার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করবেন।

আমাদের ইংরেজিশিক্ষার আরেক প্রধান অন্তরায় এই যে, সে ভাষার ব্যাকরণটাও শিখতে হয় ইংরেজি ভাষাতেই। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।—

ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণশিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কি অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়!…ভাষা এবং ব্যাকরণ দুই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে? তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত।/যে ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম, অবশেষে একবার ব্যাকরণজ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষা সহজ হইয়া আসে।

-সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫২

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিদেশী ভাষাকে ছাত্রগণের কাছে সুগম করবার উপায় হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞানকে মাতৃভাষার ব্যাকরণের উপরে দৃঢ়রূপে

প্রতিষ্ঠিত করা, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ভাষার ব্যাকরণও শিখতে দেওয়া মাতৃভাষারই সাহায্যে। যার বাংলা ভাষার ব্যাকরণই ভালো করে আয়ত্ত হয়নি তাকে যদি ইংরেজি ব্যাকরণ ইংবেজিতেই শেখাবার চেষ্টা করা যায়, তা হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। একবার যদি একটি দীপ জ্বালানো যায়, তবে তারই শিখাস্পর্শে আরও বহু দীপ জ্বালানো সহজ হয়; প্রত্যেকটি দীপ জ্বালাতেই যদি চকমকি ঠুকতে হয় তা হলে যে অকাবণে সময় ও শক্তিব অপচয় ঘটে, একথা বুঝতে কে না পাবে? সব ভাষাবই মূলভিত্তি এক। বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া লিঙ্গ বচন কর্তা কর্ম ইত্যাদি সব ভাষাতেই আছে। ভাষাজ্ঞানেব এই মূলকথাগুলির সঙ্গে যদি মাতৃভাষার সাহায্যে অল্প বয়সেই ছাত্রদের ভালো করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ইংরেজি ব্যাকরণেব বিশেষত্বগুলি শেখাতে আর কত সময় লাগে, বিশেষতঃ সেই ইংরেজি ব্যাকরণও যদি বাংলাতেই লিখিত হয়?

এক সময়ে আমাদের দেশে সংস্কৃতভাষাও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাকরণের সাহায্যেই শেখানো হত। তাতে প্রথমশিক্ষার্থীর উপরে যে কঠিন পীড়ন হত তা উপলব্ধি করতে পেরেই 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। আজ শতাধিক বৎসর যাবৎ সেই উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদীই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদের প্রধান অবলম্বন। তাতে যে আমাদের জাতীয় শক্তির কতখানি অপচয় নিবারিত হয়েছে, তা কি

আমরা একবারও ভেবে দেখি? যদি বাংলা ভাষার যোগে সংস্কৃত শেখাবার ব্যবস্থা না হত, তা হলে আজ হয় ইস্কুল-কলেজ থেকে সংস্কৃত শেখা প্রায় উঠে যেত, না-হয় এক সংস্কৃত শিখতেই আমাদের অধিকাংশ সময় কেটে যেত। এই দ্বিতীয় কথাটি যে কত সত্য, তা আমাদের ইংরেজি শিক্ষাব ব্যবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এক ইংরেজি শিখতেই ছাত্রদের এত সময় ও শক্তি ব্যয় হয় যে, বাকি বিষয়গুলির জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। যদি ছাত্রজীবনের প্রথম কয়েক বৎসরেই মাতৃভাষার ব্যাকরণজ্ঞানকে পাকা করে নিয়ে তার পরে ইংরেজি ভাষা শেখানো আরম্ভ করা যায়, তাও উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদীর মতো বাংলায় লিখিত ইংরেজি ব্যাকরণের সাহায্যে, তা হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষানায়কগণ সমগ্র জাতির আশীর্বাদভাজন ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী রচনার পর একশো বছর অতীত হয়ে গেল, এখনও কি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করবার জন্য ও-রকম দুখানি ব্যাকরণ লেখবার সময় এল না? আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষার্থীরা দীর্ঘকাল ধরে আরেকজন 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা করে আছে। আমাদের শিক্ষাপরিষদ্‌গুলি যদি করুণাপরবশ হয়ে ব্যবস্থা দেন যে, ইংরেজি ব্যাকরণের শিক্ষা ও পরীক্ষা বাংলাতেই হবে, তা হলে অসংখ্য ছাত্র অনেক অল্প সময়েই এবং সুষ্ঠুতর রূপেই ইংরেজি শিখবে এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য অনেক বেশি অবসর পাবে। বস্তুতঃ অন্য সব দেশেই বিদেশী

ভাষা শেখার এই ব্যবস্থা। কেবল আমাদের দেশই তার ব্যতিক্রম।

সংস্কৃত হক, ইংরেজি হক, অন্য ভাষা শেখার সোপান যে মাতৃভাষা, একথা আমাদের দেশের মনীষীরাও স্বীকার করেন এবং পথ দেখিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের কথা তো এইমাত্র বলা হল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কথাও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজিসোপান', 'ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা', 'সংস্কৃত-শিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজি, বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপায়রূপে গ্রহণ করাই ছিল তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, ইস্কুলশিক্ষার স্তরে সংস্কৃতকেও সাহিত্যরূপে না শিখিয়ে (অর্থাৎ টেক্সট্‌বুকের উপর গুরুত্ব না দিয়ে) শুধু ভাষারূপে শেখালে অনেক সময়ও বাঁচে এবং ভাষাটাকেও অধিকতর ভালো করে শেখানো যায়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয়। কোনো সংস্কৃত পাঠ্যবই থাকবে না, তা নয়। তবে সে বইএর বিষয়বস্তুর উপরে গুরুত্ব না দিয়ে যদি তার ভাষাটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষা নেওয়া হয়, তবেই সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অপেক্ষাকৃত সহজে।

৪

এই তো গেল ইস্কুলশিক্ষার স্তরের কথা। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান কি হওয়া উচিত? শিক্ষার উচ্চসৌধকেও কি মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গেই এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, পশ্চিমের শিক্ষাটা আমাদের পক্ষে কেবল ইস্কুলের জিনিস হয়েই আছে, জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারেনি; সে শিক্ষায় অনেক ভালো জিনিস আছে, কিন্তু তা আমাদের চিন্তায় বা কাজে ফলে উঠতে পারছে না। তার কারণ 'আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই'। তিনি বললেন, শিক্ষার বিষয়কে আমরা অবশ্যই অন্য জায়গা থেকে নিতে পারি, কিন্তু তার ভাষা সুদ্ধ নিতে হলে সে হবে বিষম জুলুম। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। তারই ফলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে ব্যাপকও হতে পারল না, সফল হয়েও উঠতে পারল না। অতঃপর তাঁরই উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি, তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি।···দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয়, তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায়, তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে?

ভরসা করিয়া এটুকু কোনো দিনই বলিতে পারিব না যে, উচ্চ-শিক্ষাকে আমাদের দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে ?··· আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলেই তবে বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

শিক্ষার বাহন (১৯১৫)

বিদ্যাকে মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে স্থাপন করলে সে বিদ্যা কত সহজে সার্থক ও সফল হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করলেন। –

"পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে, জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষার অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে, এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ।"

জাপানি ভাষায় যা সম্ভব হয়েছে, বাংলা ভাষায় তা নিশ্চয়ই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষায় শক্তি জাপানির চেয়ে বেশি। জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণের উৎসাহ দিয়েই তিনি

নিরস্ত হননি। উচ্চশিক্ষাকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি আছে, তাও খণ্ডন করতে প্রয়াসী হলেন।--

"ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বই কি, সেই জন্যই কঠোর সংকল্প চাই।"

জাপানি ভাষায় যদি উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, তবে বাংলাতেই হবে না কেন? আরএক বিরুদ্ধ যুক্তি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তথা পরিভাষার অভাব। এই আপত্তির উত্তর বস্তুতঃ ১৮৯৩ সাল থেকেই দেওয়া হচ্ছে। তখনই এসম্বন্ধে লোকেন্দ্রনাথ পালিত লেখেন—

যদি বাংলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাংলায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে, বাঙালিতে বাঙালি ছেলেদের জন্য বাংলার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু ইংরাজি ভাষায়! যদি বাংলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলা ভাষায় লিখিতেন না?

—সাধনা, ১২৯৯ মাঘ, পৃ ১৯৭

রবীন্দ্রনাথও তখনই এপ্রসঙ্গে লিখলেন—

সিণ্ডিকেট-সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন, তবে দরিদ্র বাঙালি একাজে এখনি নিযুক্ত হয়। ম্যাকমিলান সাহেবকে অনেক কাল অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন

ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে। ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় ত তরজমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞানবিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই, যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।

—সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র, পৃ ৪৫১

অতঃপর ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তাঁকে আবার এই আপত্তি খণ্ডন করতে হয়।—

"আমি জানি, তর্ক এই উঠিবে— তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচু দরের শিক্ষা-গ্রন্থ কই? নাই, সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা-গ্রন্থ হয় কি উপায়ে?…বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।…দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?"

উচ্চশিক্ষাকেও মাতৃভাষার যোগেই বিতরণ করবার অত্যাবশ্যকতা কি, এ প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবেই লিখলেন—

দেশের মনকে মানুষ করা কোনো মতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে আমাদের

ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না —সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে? তার ফল হইয়াছে -- উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি, তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না।

—শিক্ষার বাহন (১৯১৫)

আমাদের উচ্চশিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা, কিন্তু আমাদের চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার এই বিচ্ছেদের ফলে আমরা উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা করবার অবলম্বন থেকেই বঞ্চিত হয়েছি। ফলে উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনের পরিপোষণ হচ্ছে না। আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষা ও আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে না। ফলে আমাদের জাতীয় মন ও জাতীয় জীবন আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারছে না, আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুফল থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এক কথায় আমাদের পরভাষা-বাহিত উচ্চশিক্ষা দেশের অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয়ের হেতুমাত্রই হয়ে রয়েছে, উচ্চশিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য তার দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছে না। এই হচ্ছে সংক্ষেপে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধের মর্মকথা।

কিন্তু ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে স্বীকার করবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কেননা তখন পর্যন্ত ইস্কুলশিক্ষার বাহনরূপেও ইংরেজিরই একাধিপত্য। তথাপি তিনি যে বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে স্বীকারের প্রস্তাব করলেন, তাতে কম সাহসের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু একান্ত ব্যর্থতার স্থলে আংশিক সার্থকতার আশায় তাঁকেও একটি রফানিষ্পত্তির প্রস্তাব করতে হল। এই রফার কথা পরে বলছি। তার আগে দেখা যাক তিনি এই রফাব কথা বললেন কাদের হিতার্থে। বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষাকে মাতৃভাষার সচল ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দিলে সে শিক্ষা সমস্ত দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র দেশেরই কল্যাণের হেতু হবে। তা ছাড়া এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিশেষভাবে উপকৃত হবে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি ওই প্রস্তাব করলেন। যেসব ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আগ্রহী অথচ ইংরেজি ভাষার দুরূহতা অতিক্রম করতে অসমর্থ, তারাই বিশেষভাবে তাঁর লক্ষ্যস্থল। তাই আশু মুখুজ্জে মশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলা শিক্ষার প্রবর্তন করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সে প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেন তা এই—

তিনি (আশু মুখুজ্জে মশায়) যেটুকু করিয়াছেন, তাহার ভিতরকার কথা এই— বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হক, বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে, তাদেরই বিদ্যাকে

চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?···

ভালো মতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলা দেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?··· মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে?

—শিক্ষার বাহন

পূর্বে যে রফানিষ্পত্তির কথা বলেছি, তা এই ইংরেজি ভাষায় অপটু ভালো ছাত্রদের দিকে তাকিয়েই করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রফানিষ্পত্তির প্রস্তাবটি এই—

"প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? একে তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে। ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি। সুতরাং আদরও বেশি।···তা হোক, বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইংরেজির পাশে একটি বাংলা পথ খুলে

দেওয়া হয়, তাহলে তার ফলাফল কি হতে পারে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন—

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষাব ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায়, তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের শাদা এবং কালো রেখার দাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীব হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।···

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কিনা সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে, এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে। সে সুবিধাটা এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তাব একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে, তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে, তারাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে

না। কারণ দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন, তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন। এমনি করিয়া যাহা সজীব, তাহা কালক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে···এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে, তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দিবে।”

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইংরেজি ও বাংলা দুই ধারা প্রবর্তিত হয়, তবে প্রথম ধারা থেকে যারা বেরিয়ে আসবে, তারা হবে সরকারি ডিগ্রিধারী, ব্যবসা ও চাকরির যোগ্য; যথার্থ শিক্ষার বিকাশ এধারায় হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ধারা থেকে যেসব ছাত্র উত্তীর্ণ হবে, তারা সরকারী বা বেসরকারী চাকরির যোগ্য বলে গণ্য না হতে পারে, কিন্তু তারাই হবে যথার্থ শিক্ষার অধিকারী এবং এই ধারাতেই ঘটবে বাঙালির প্রতিভার বিকাশ। এভাবে দেশে শিক্ষা সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও অন্তরের কামনা। কিন্তু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই কামনাকে সার্থক করে তোলবার কোনো প্রয়াসই করেনি তাঁর জীবিতকালে। আজ তাঁর তিরোধানের পরে এই স্বাধীন দেশেও কি বাঙালির

শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবাব দিকে কোনো প্রয়াস দেখা দিয়েছে ?

৫

রবীন্দ্রনাথ জানতেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়রূপ কলটাতে তাঁর এই আধাআধি রফার প্রস্তাবটাও গৃহীত হবাব সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি তখনই (১৯১৫) সাহস করে সরকারি অর্ধাঙ্গ বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই উত্থাপন করলেন। বললেন—

"ওই কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা ? ওটা দেশের আপিস আদালত···প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া যাক না।···গুরুর চারিদিকে শিষ্য যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিক কালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা-তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক না কেন ?"

এই যে সাহস করে স্বভাবের নিয়মে ও ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তন করে জীবনের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে তোলবার কথা বলা হল, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে 'বিশ্বভারতী'

সৃষ্টির প্রথম বীজ উপ্ত হল। ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষাই কয়েক বছরের মধ্যে 'বিশ্বভারতী' রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে (১৯১৮)।

কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষাই যে সৃষ্টির মূলে, সে কথা উক্ত প্রবন্ধে এবং স্বাধীন বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। ওই উক্তির মধ্যে যে ভাবী সৃষ্টির পূর্বাভাস নিহিত ছিল, তখন তা কেউ ধরতে পারেন নি। আজ তা আমাদের কাছে অতি স্পষ্টভাবেই নিজের অর্থ প্রকাশ করছে। তাঁর সেই সৃষ্টিগত কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা এখানে উদ্‌ধৃত করি।—

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

—শিক্ষার বাহন, সবুজপত্র ১৩২২

মাতৃভাষার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয় চাই,—এই কল্পনার মন্ত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ, সাধক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকুহর থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল ১৯১৫ সালেই। তার তিন বছর পরেই এই কল্পনা ও ইচ্ছা বিশ্বভারতীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয় আরও কয়েক বছর আগেই। 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধেও (১৯১১) এই আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই।—

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই।···এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভ আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখানকারই কালের ধর্মবশত।···আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে। সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি, তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে। অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে, সেই চেষ্টার মূলে এই আকাঙ্ক্ষা।···

যাহার ইচ্ছার জোর আছে, সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে।···ইচ্ছাশক্তি যাহার

দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা।...আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই।...আমি দেখিতেছি, আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই জাগ্রত চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি।

—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী ১৩১৮ অগ্রহায়ণ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ক'রে, তার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তন ক'রে, আমাদেরই বিদ্যা ও আমাদেরই বাণীকে সে শিক্ষার মন্দিরে উপযুক্ত স্থান দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত চিত্তে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, পরবর্তী কালে তাই বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠানে কর্মের রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের নিজের বিদ্যা ও নিজের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার যে আদর্শ, তারই মধ্যে শিক্ষায় মাতৃভাষাকে উপায় ও লক্ষ্যরূপে স্বীকারের কথা নিহিত রয়েছে।

অতঃপর স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনেও এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অতি স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে।—

It is Sir Rabindranath's strong conviction that, while English should be skilfully and thoroughly taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges upto the stage of the university degree) should be the mother tongue. He has four reasons for this belief; first, because it is through his mother tongue that every man learns the deepest lessons of life; second, because some of those pupils

who have a just claim to higher education cannot master the English language ; third, because many of those who do acquire English fail to achieve true proficiency in it and yet, in the attempt to learn a language so difficult to a Bengali, spend too large a part of the energy which is indispensable to the growth of the power of independent thought and observation ; fourth, because a training conducted chiefly through the mother tongue would lighten the load of education for girls whose deeper culture is of high importance to India. He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in schools. For these reasons, in his own school at Bolpur he gives the central place to studies which can best be pursued in the mother tongue.

—স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদন (১৯১৯) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬-২৭

উদ্‌ধৃত অংশে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অভিমতে নূতনত্ব কিছুই নেই। 'শিক্ষার হেরফের' বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ এবং 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তাই এস্থলে অতি সংক্ষেপে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশিত হয়েছে। শুধু নারীশিক্ষার বিস্তার ও গভীরতার প্রয়োজনে মাতৃভাষাকে বাহনরূপে স্বীকারের কথাটি নূতন। আর মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাতৃভাষাকে শুধু ইস্কুল নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষারও আশ্রয় করে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধেই রয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৬

অতঃপর শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর নূতন কথা কিছুই বলেন নি। কিন্তু জীবনের প্রান্তে ওই একই কথা নূতন ভাষায়, নূতন ভঙ্গিতে বার বার দেশের কাছে নিবেদন করে গিয়েছেন। এখানে তার থেকেই কিছু কিছু অংশ সংকলন করে দিলাম।—

একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার···তার প্রধান ক্ষতি ছিল যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে।···এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এই জন্যেই সে সকল দেশে সে-ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।···

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করল না।···আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব উঠে, তখন অধিকাংশ ইংরেজিজানা বিদ্বান্ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।···

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁব (আশুতোষের) মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলা ভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি, একথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে, না হবার কারণ তাঁর শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যেব মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা কবে সাহস করে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনেব উপযুক্ত হয়ে উঠবে।···আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল।···আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গ-বাণী বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে।

—বিশ্ববিদ্যালযের রূপ, ১৯৩৩

এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে। ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পাঠ কবেন, তাতেও তিনি বলেন—

এমন মানুষ আজও দেশে আছে, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।···একদিন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যখন আমার শক্তি ছিল, তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা ভাষায়

তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়।

—শিক্ষা। বিবিরণ, ১২৩৩

লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের মতে নিম্ন এবং উচ্চ সর্বপ্রকার শিক্ষারই বাহন হওয়া চাই মাতৃভাষা, এমন কি, ইংরেজি সাহিত্যকেও বসাতে হবে মাতৃভাষারই পুণ্যপীঠের উপরে। এটাই যে স্বাভাবিক এবং অন্য সব দেশেরই সবস্বীকৃত রীতি, সে কথাটাও আমরা একবার ভেবে দেখতে চাই না, এমনি অস্বাভাবিকতা পেয়ে বসেছে আমাদের মনোবৃত্তিকে।

অতঃপর ১৯৩৬ সালে 'শিক্ষাসপ্তাহ' উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নামে যে ভাষণটি তিনি পাঠ করেন, তার মূলকথাই হল মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকারের জন্য আবেদন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে একটু একটু করে স্বীকার করা হচ্ছে, কিন্তু তার মন্থরতা নৈরাশ্যকর। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হল—

আমি যে আজ উদবেগ প্রকাশ করছি, তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারি এবং বাংলা ভাষার পথ এখনও কাঁচা পথ। এই সমস্যা সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি-অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমার ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা

সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি, পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই ভাবে।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

অতঃপর তিনি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ প্রকাশ করলেন, যার সর্বাবয়বেই থাকবে মাতৃভাষার কল্যাণস্পর্শের আশীর্বাদ। মাতৃভাষার বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আকাঙ্ক্ষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি নাম দিলেন 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়'। তাঁর মতে এই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই অচিরকালের মধ্যেই। হক তা স্বল্পায়তন, কিন্তু চারাগাছের মতোই তার সজীব ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার, যেন কালক্রমে সে তার পরিণত ও বিপুল মহিমার ছায়াতলে সমগ্র দেশকে আশ্রয় দিতে পারে। সেই ভাবী মহিমার প্রাথমিক সূচনা দেখে যাবার ব্যাকুলতা থেকেই তিনি বললেন—

বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই।...বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক-বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ভাবী কালে এই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজাসনের অসপত্ন অধিকার হবে তারই। কিন্তু 'বাংলা-বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না'— একথাও তিনি জানতেন। তাই তিনি 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি করে এই প্রবন্ধেও রফানিষ্পত্তির প্রস্তাব করে বললেন, ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন চলছে চলুক, তার পাশেই একটি সর্বাঙ্গীণ বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হওয়া চাই। হক তা স্বল্পায়তন, হক তার মর্যাদা গৌণ, কিন্তু তার আবির্ভাবকে বিলম্বিত করা চলবে না। মাতৃভাষাকে শিক্ষামন্দিরের প্রত্যেক কক্ষেই আসন দেওয়া চাই ; হক তা নিম্নাসন, কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করে অকৃতার্থ করা চলবে না। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল আবেদন বাংলাদেশের শিক্ষাধিনায়কদের কাছে।

অতঃপর ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন (ফেব্রুআরি, ১৭), তাতেও তিনি মাতৃভাষাকে বিশ্ব-বিদ্যার মন্দিরে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার আবেদনই জানান। ১৮৮৩ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্রোতোধারাকে মাতৃভাষার স্বাভাবিক পথে বিশ্ববিদ্যার সংগমতীর্থে পরিচালিত করবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর এই চিরবাঞ্ছিত বহুপুনরাবৃত্ত এবং নিত্যউপেক্ষিত আদর্শের কথা বোধ করি শেষবারের মত দেশের কাছে উপস্থাপিত করলেন ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ সভায়। সে সভায় তিনি বললেন—

সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা। পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর

আর কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।···বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব, তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয়নি কেবল মাত্র আমাদেরই দেশে।··· পরাসক্ত মনকে চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায় শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রয়োগ করার চর্চা।···দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।···

ইংরেজিশিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে ; এই প্রদেশের শিক্ষা-নিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেকদিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করছে।···

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না ; বিশ্ববিদ্যা-লয়ের তুঙ্গমঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন।···বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা লাভে গৌরবান্বিত হবে,সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি ; তাই সমস্ত

বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আমাব উপস্থিতি।…এতে বোঝা গেল, বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু-পবিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়াব শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

—ছাত্রসম্ভাষণ, ১৯৩৭

এই উক্তির পরে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। দেশেব উপর থেকে পাশ্চাত্ত্য শাসনের অবসান হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শীতের হাওয়া এখনও বইছে প্রবল বেগেই; নবঋতু-সমাগমে নবপুষ্পপল্লব-সম্ভাবনার আভাস-মাত্রও দেখা যাচ্ছে না। 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়েব একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই', রবীন্দ্রনাথের এই সুচিরপোষিত কামনা এখনও পর্যন্ত কবিদৃষ্ট স্বপ্নের বস্তু হয়েই রইল। ববীন্দ্র নাথের এই স্বপ্ন যে অসম্ভবের পায়ে মাথাকোটা মাত্র নয়, তাব প্রমাণস্বরূপ তাঁরই একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করছি—

আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম, তখন সেখানে আট বছব মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথম ভাগে অনেককাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট্ রাজ্যে প্রজা-সাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে, সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬

স্বাধীন দেশের অধিনায়কদের চিত্তকে রবীন্দ্রনাথের এই

বেদনাতুর উক্তি কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারবে কি না সন্দেহ। তবু যে বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচনা করলাম, তার মূলেও রয়েছে তাঁরই আর একটি সংশয়হীন উক্তির প্রেরণা। সে উক্তিটি এই—

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজন-স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার লোক বারে বারে পাওয়া যাবে।

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

৭

খাদ্য যতক্ষণ আমাদের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত না হয়, ততক্ষণ তার দ্বারা জীবনশক্তির পোষণ হয় না, বরং সেই অজীর্ণ খাদ্য দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে বিনাশের দিকেই এগিয়ে দেয়। শিক্ষাও তেমনি মাতৃভাষার যোগে আমাদের স্বাভাবিক মনন-ধারার সঙ্গে যুক্ত না হলে তার দ্বারা চিত্তের পুষ্টি তো হয়ই না, বরং সেই অস্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা আমাদের মনের বহুবিধ বিকৃতিরই উৎস হয়ে ওঠে। শিক্ষার এই স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশে আবহমানকাল চলে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংস্কৃত ও ফারসির চাপে বাঙালি মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ ব্যাহত হয়েছে,

আধুনিক কালে হয়েছে ইংরেজির চাপে। ফলে আমাদের চিত্তমুক্তির অবকাশ কখনও ঘটেনি। শিক্ষাকে পরভাষার পীড়ন থেকে মুক্ত করে মাতৃভাষার যোগে আমাদের চিত্তবিকাশের অন্তরায় ঘোচাবার প্রয়োজনীয়তা কার মনে প্রথম দেখা দেয় জানি না। যতদূর জানি, তাতে মনে হয়, মাতৃভাষার যোগে শিক্ষামুক্তির বাণী প্রথম উচ্চারণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৮৮০ সালেই তিনি 'কালেজী-শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাকে বিদেশী ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। তার থেকে একটু অংশ উদ্‌ধৃত করি।—

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই, সে-শিক্ষা কোন কাজেরই নয়।...যাহা একটু কালেজে শিখি, তাহার শিখিবার উপায়ও ভাল নহে।...যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজ হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চার ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে।...বাংলা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম।...ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজিতে অঙ্ক করিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাংলা দিয়া ইংরেজি শিখ না কেন? ইংরেজি দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন?

আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজিমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজি শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না ; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। —বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ ভাদ্র

পরভাষাবাহিত শিক্ষার ব্যর্থতা সম্পর্কে হরপ্রসাদের এই মন্তব্যই বোধ করি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উক্তি (১৮৮০)। আর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য পাই সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ দশজন দেশী ও বিদেশী মনস্বিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৪৯)। তাঁদের অভিমতের সঙ্গে হরপ্রসাদের মন্তব্যের সাদৃশ্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যোগ্য।—

English cannot continue to occupy the place of state language as in the past. Use of English as such divides the people into two nations, the few who govern and the many who are governed, the one unable to talk the language of the other, and mutually uncomprehending. This is a negation of democracy.

It is educationally unsound to make a foreign tongue the means of acquiring knowledge. Dr. Hans, Lecturer in Comparative Education in the London University, points out in his recent book the serious drawbacks in adjusting a foreign language as a medium of instruction. He says,—

"Before entering school the pupils have acquired a proficiency in the mother tongue, have built up a vocabulary covering most of the objects of sense impressions and their daily activities. At school they have to

superimpose on this basis a language of ideas and abstract relations, expressed entirely in a foreign medium. Their minds become split into two watertight compartments, one for ordinary things and actions expressed in their mother tongue, and another for things connected with school subjects and the world of ideas expressed in a foreign language. As a result they are unable to speak of their home affairs in the school language and about learned subjects in their mother tongue."

And not only the individual but *the nation develops a split consciousness,* the "Babu Mind." This is what happened in India under British rule. We have paid a heavy price for learning in the past. Instead of laying stress upon thinking and reasoning we emphasised memorising, in place of acquiring knowledge of things and realities, we acquired a sort of mastery over words. It affected originality of thought and development of literature in the mother tongue. We have impoverished ourselves without being able to enrich the language we so assiduously studied. It is a rare phenomenon to find the speaker of one tongue contributing to great literature in a different language. *The paucity of great literature which is the inevitable cousequence of devotion by the educated to a language other than their own is a double loss—intellectual and social,* for great literature is a powerful factor in fostering culture, refinement and true fellowship.

Whatever the advantages of English and the immediate risks in a change over to the new, the balance of advantage on a long view of the matter lies in the change.

[বক্রলিপি লেখকের]

—রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদন, পৃ ৩১৬-১৭

অনেকটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল। কারণ এই অংশটুকুর মধ্যেই আমাদের শিক্ষার বাহন সমস্যার কথা অতি সংক্ষেপে অথচ সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমন অল্প-পরিসরের মধ্যে এই সমস্যার এত পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কোথাও দেখিনি। অতঃপর এই কমিশনের সুপারিশগুলিও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।—

We recommend ·

3. That for the medium of instruction for higher education English be replaced as early as practicable by an Indian language which cannot be Sanskrit on account of vital difficulties.

4. That (i) pupils at the Higher Secondary and University stages be made conversant with three languages, the regional language, the federal language and English (the last one in order *to acquire the ability to read books in English*) and, (ii) Higher education be imparted through the instrumentality of the regional language with the option to use the medium of instruction either for some subjects or for all subjects.

—রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রতিবেদন, পৃ ৩২৬

বলা প্রয়োজন যে, ফেডারেল ভাষা বলতে এখানে হিন্দিকেই বুঝিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা-প্রমুখ মনস্বীদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মাতৃভাষাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষারও বাহন বলে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। ইংরেজিকে যে তার বর্তমান একেশ্বরত্বের অধিকার' থেকে নামিয়ে এনে তাকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত

করতে হবে, এ বিষয়েও তাঁদের অভিমত সংশয়াতীত। নতুবা আমাদের শিক্ষা কখনও স্বাভাবিক গতি পেতে পারবে না। আর শিক্ষা যদি দেশের চিত্তে স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হতে না পারে, তবে আমাদের কল্যাণের আশাও সুদূবপরাহত।

উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বাহন-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে 'ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ'। অর্থাৎ ভাষাব উন্নতিই হচ্ছে জাতীয় উন্নতির প্রধান মাপকাঠি, আর জাতীয় উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। শিক্ষাব ক্ষেত্র থেকে মাতৃভাষাকে নির্বাসিত করলে উন্নতিলাভের প্রধান অবলম্বনকেই জেনেশুনে বিনষ্ট করা হয়। অতঃপর স্বামীজির উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য-রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধাবণ লোকের ভাষায় শিক্ষা দিয়েছেন।

—ভাববার কথা, বাঙ্গালা ভাষা (১৯০০ ফেব্রুয়ারী ২০)

'দেবভাষা' সংস্কৃত ভারতীয় বিদ্যার বাহন হবার ফলে দেশের কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা উদ্‌ধৃত উক্তিতেই প্রকাশ। এ ক্ষতি থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য বুদ্ধ-প্রমুখ লোকহিতার্থীরা লোকভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। ভারতে এবং বহির্ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের একটা বড় কারণ সর্বত্রই লোক-ভাষার আশ্রয় গ্রহণ। বৌদ্ধধর্ম যে-দেশে গেছে সে-দেশের

ভাষাকেই আশ্রয় করেছে ; প্রত্যেক দেশই নিজ ভাষার যোগেই উদ্‌বুদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে, কোনো পর ভাষার পীড়নে পিষ্ট ও আড়ষ্ট হয়নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সর্বলোকহিত'-ব্রতী সম্রাট অশোকের আমলকেই সবচেয়ে গৌরবের যুগ বলে স্বীকার করা হয়। এই গৌরবেরও অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই বাণী প্রচার করেছিলেন স্থানীয় লোক-ভাষাতেই, কোনো দেবভাষা বা ধর্মভাষার আশ্রয় তিনি নেননি। 'নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎ পা' (সর্বলোকের হিত সাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই) এই ছিল যাঁর মহৎ বাণী, তিনি যে প্রদেশে প্রদেশে লোকভাষাকেই বাণী ও বিদ্যার বাহন বলে স্বীকার করে নেবেন তা বিচিত্র নয়। চৈতন্যদেবও যে সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা ভাষাকেই ধর্মপ্রচারের বাহন করেছিলেন, তার ফলেই মধ্যযুগে বৈষ্ণব ভাবকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্য এমন অভূতপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছিল। ইউরোপেও মার্টিন লুথার প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারকদের প্রভাব যে প্রত্যেক দেশের জাতীয় সাহিত্যের মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিল সে কথা কে না জানে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগে কবীর নানক এবং আধুনিক কালে রামমোহন-প্রমুখ ধর্ম প্রবক্তাদের আবির্ভাবের ফলও হয়েছে একই, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েছে সতেজে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণীয়। ইউরোপের ইতিহাসে দেখি ইতালীয় ভাষার উদ্‌বোধনের মূলে রয়েছে

যে-সব প্রভাব, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শ। তেমনি ফরাসি সাহিত্যও এক সময়ে জর্মান ও রুষ সাহিত্যকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে পুনরুজ্জীবন লাভের পথে। আমাদের দেশে সে কাজ করেছে ইংরেজি সাহিত্য। ইউরোপে গ্রীক-লাটিন বা ফরাসি সাহিত্য কোনো জাতীয় ভাষাকেই দাবিয়ে রাখতে পারেনি, যতদিন দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে ততদিনই ক্ষতি হয়েছে। এদেশে সংস্কৃত এবং ইংরেজিরও সেই ভূমিকা। যতদিন এদের একাধিপত্য চলেছে ও চলবে ততদিনই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় ঘটেছে ও ঘটবে। আমাদেব জাতীয় সাহিত্যে জীবনে প্রাণের শিখা জ্বালিয়ে দেওয়াতেই ও দুই ভাষাব সার্থকতা, জাতীয় জীবনে গৃহদাহ ঘটানোতে নয়।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। লোকভাষাই হচ্ছে সমস্ত উচ্চাঙ্গ বিদ্যার স্বাভাবিক আধার বা বাহন এবং তাই হওয়া উচিত, এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ অভিমত।—

যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর।···যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচ জনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি···তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।···যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।

—ভাববার কথা, বাঙ্গালা ভাষা

স্বামীজি অবশ্য কথাগুলি বলেছিলেন সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষার প্রসঙ্গে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত তথা ইংরেজি বনাম বাংলা (অবশ্য চলতি) ভাষা প্রসঙ্গেও কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। যে স্বাভাবিক ও জ্যান্ত ভাষায় আমরা নিত্য কথা বলি, চিন্তা করি, সে ভাষাই দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত উচ্চাঙ্গের বিদ্যার আদর্শ বাহন, কোনো মৃত বা কৃত্রিম ভাষা নয়। অর্থাৎ সংস্কৃত বা ইংরেজি নয়, আমাদের মাতৃ-ভাষাই সমস্ত উচ্চাঙ্গ শিক্ষা ও বিদ্যার স্বাভাবিক বাহন ও আধার।

১৯০০ সালে স্বামীজি যে কথাগুলি বলেছিলেন, বিদ্যাকে জীবন্ত ও জাতিকে বলিষ্ঠ করে তোলবার যে পথ নির্দেশ করেছিলেন, আজ ষাট বৎসরের অধিক কাল পরেও তা স্মরণীয়তা হারায়নি। আমাদের শিক্ষা ও বিদ্যা স্বাভাবিক বাহন পায়নি। আমরা যে ভাষায় কথা কই, বিচার-বিতর্ক করি বা চিন্তা করি, সে ভাষায় লিখি না। আর যে ভাষায় লিখি সে ভাষায় ভাবি না। তাই আমাদের শিক্ষার হেরফের ঘোচে না। আমাদের চিন্তা ও প্রকাশের এই যে দ্বৈতরূপ, তাকেই আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেছেন 'split consciousness'। তাই আমাদের জাতীয় চিত্ত আজ চিন্তায় ও প্রকাশে দ্বিধা বিভক্ত, জাতীয় জীবন আজ শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে দ্বিধা বিভক্ত। এরকম দ্বিধাগ্রস্ত জাতি যে কখনও ঐক্যের বলে বলীয়ান্ হয়ে সার্থকতার তীরে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তাও যে বলে দেবার অপেক্ষা রাখে এটাই আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

১৮৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত হরপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন, গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, আশুতোষ, রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ-প্রমুখ মনীষীরা শিক্ষাকে মাতৃভাষার স্বাধিকারের উপরে স্থায়িত্ব দানের জন্য যে আবেদন করে এসেছেন, বাংলা দেশে বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার যে আদর্শ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেছেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষাধিনায়কদের দৃষ্টি সেদিকে কবে আকৃষ্ট হবে জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে—

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল, সেইটেই রয়েছে সবচেয়ে পর হয়ে; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।…এশিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যেসব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে, তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণঠাসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি।

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ

নানাকারণে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে জনমত আজ জাগরূক হয়ে উঠেছে কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত। আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে প্রচুর পরিমাণেই। কিন্তু বিশ্বভারতীর পক্ষে সহায়ক ও সাংগঠনিক আলোচনা বা সমালোচনা খুবই কম হয়েছে।

বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নকল হবে না, তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা চাই, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করাই বিশ্বভারতীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে আচার্য জওহরলাল থেকে সাধারণ সমালোচক পর্যন্ত সকলেই একমত। বিশ্বভারতী-আইনে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী ও তার বিশিষ্টতাকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে, আর মহাত্মা গান্ধী সে ভার অর্পণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং যে শিক্ষা-নীতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রবল আবেগের সঙ্গে দেশের শিক্ষানায়কদের কাছে বারংবার উপস্থাপিত করেছেন এবং যে নীতি মহাত্মা গান্ধীরও আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছে, তা যে বিশ্বভারতীর অন্যতম মূলনীতি বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সেই নীতি

রক্ষার দ্বারাই যে বিশ্বভারতীর বিশিষ্টতা রক্ষিত হবে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। এমন একটি নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সে নীতিটি হচ্ছে বিদ্যাবিতরণের সর্বস্তরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন-রূপে স্বীকৃতিদানের নীতি।

একথা আজ কে না জানে যে, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য দেশের কাছে বারবার আবেদন করে গেছেন। পূর্ববর্তী 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রবন্ধটিতে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবু বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।

১৮৮৩ সালে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—

বঙ্গ-বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।

—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক

১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন—

"আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে।···শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ মিলন কে সাধন করিতে পারে?—বাংলা

ভাষা, বাংলা সাহিত্য।···বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদব করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমনকি, বাংলায় চিঠিও লেখে না।··· আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না।···তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপন মাতৃভাষাকে দৃঢ় সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা [শিক্ষিত লোকেরা] দূরে পড়িয়া গেছেন।"

অর্থাৎ মাতৃভাষার যোগে বিদ্যালাভ করেন না বলে আমাদেব শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যাটাও যথার্থরূপে আয়ত্ত হয় না এবং মাতৃভাষায় সে বিদ্যাকে প্রকাশ করবার সামর্থ্যও লাভ করেন না। যে বিদ্যা মাতৃভাষায় প্রকাশ লাভ করে না সে বিদ্যা তো বন্ধ্যা।

অতঃপর 'শিক্ষার বাহন' (১৯১৫) নামক প্রবন্ধটির কথা সকলেরই মনে পড়বে। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ওই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আসল কথা আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই"। এই প্রসঙ্গেই অতঃপর বলেন—"আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা

ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়. এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া চলিবে।"

ওই প্রবন্ধেরই অন্যত্র আছে—"ইংরেজি আমাদের শেখা চাই-ই। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি, জর্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে একথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, একথা কোন্ মুখে বলা যায়?"

যে সময়ে এ প্রবন্ধটি লেখা হয় তখন শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে তার একমাত্র বাহন বলে গ্রহণ করবার লেশমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুসরণ করে আপোসরফার পরামর্শ দিলেন—বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি দুই ব্যবস্থা চলুক; একদিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলুক ইংরেজিতে, অপরদিকে সে কাজ চলুক বাংলায়।

বলা বাহুল্য এই আপোসরফার পরামর্শও তখন গৃহীত হয়নি, আজও এই স্বাধীনতার যুগেও গৃহীত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ পরাধীনতার স্থুল রূপটাই অপসৃত হয়েছে, কিন্তু তার অদৃশ্য মায়াজালটা আমাদের হৃদয়মনকে এখনও মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। ইংরেজের শাসন গিয়েছে, ইংরেজির শাসন যায়নি। এই শাসনের অধিকার আমাদের দেহের উপরে নয়, তার অধিকার আমাদের অন্তরে। তার সম্বন্ধে বলা যায়, "নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"।

রক্তকরবীর জালের মতো এই মোহজালও অদৃশ্য বলেই দুশ্ছেদ্য।

এইজন্য ১৯৩৩ সালে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

"রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।"

এই আক্ষেপ প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজলাভের পরেও চোদ্দ বৎসর পার হতে চলল, তথাপি এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ এল না, এমন কি সে স্বরাজ পাবার উৎসাহও আমাদের জাগেনি, আর শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে বসালে তার মুল্যহানি ঘটবে বলে যারা মনে করে এমন মানুষের অভাবও ঘটেনি।

যা হক, রবীন্দ্রনাথ এই আক্ষেপোক্তি শেষ করেন বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হৃদয়ের আর্ত আবেদন জানিয়ে।

অতঃপর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৬) তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নিজের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেন—

"বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।...আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ—

যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাই চলেছিল। এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশু মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি।

···ভাষার চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস-পূর্ব্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।···তার প্রধান কারণ,···শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না দেওয়া মাতৃভাষায়"।

বিশ্বভারতীর শিক্ষানীতির একদিকের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে এই উক্তি থেকেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের প্রেরণাই ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে।

"শিক্ষার সাঙ্গীকরণ" প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তার হৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষায় ও একটি বাক্যে।—"বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব শিশুমূর্তি দেখতে চাই।"

এর পরের বৎসর (১৯৩৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

'পদবী-সম্মান-রিতরণ' সভাতেও তিনি তাঁর 'ছাত্রসম্ভাষণে' এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেন।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে,' 'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না ;' এই যাঁর অন্তরের বাণী, তিনিই যে মাতৃভূমির কাছে মাতৃভাষার জন্য বার বার আবেদন জানিয়েও নিরস্ত হবেন না, তা বিচিত্র নয়। তাই তিনি শেষবারের মত বললেন, "ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষা-নিকেতনেও সে আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেকদিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।" অবশেষে, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনেব আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে", এই আশা নিয়েই তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই আশা আজও পূর্ণ হয়নি। কিন্তু 'তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। তাই তিনি সুদূর অনাগতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের জন্য এই বাণী রেখে গিয়েছেন।—

"সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

—শিক্ষাব সাঙ্গীকরণ

বলা বাহুল্য, তাঁর এই শেষ উক্তিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমেই কামনা প্রকাশ করেছিলেন, ‘বঙ্গবিদ্যালয়ে’ দেশ ছেয়ে গিয়ে বাংলা ভাষার যোগে সমস্ত শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক, আর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন, একটি ‘বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি দেখে যেতে চাই।’ তাঁর জীবিতকালে এই দুই কামনার কোনোটিই পূর্ণ হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসবকালও সমাগত; কিন্তু তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো লক্ষণ আজও বাংলার শিক্ষাদিগন্তে আভাসেও ফুটে ওঠেনি। তিনি বারবার চার বার বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে বেদনার্ত আবেদন জানিয়েছেন, তাও আজ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্যই রয়ে গেল। তিনি যখন এই পৌনঃপুনিক আবেদন জানাচ্ছিলেন তখনও তাঁর বিশ্বভারতী বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করেনি। তাঁর তিরোধানের দশ বৎসর পরে বিশ্বভারতী যখন বিধানসম্মত স্বীকৃতি লাভ করল, তখন আশা হয়েছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানই অবশেষে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে। তাই যখন বিশ্ব-ভারতীতেও রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার লেশমাত্র আভাসও কোথাও দেখা গেল না, ‘তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়’।

আমাকে বারবারই শুনতে হয়েছে, বিশ্বভারতী তো শুধু বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া

প্রভৃতি সব দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তো আন্তর্জাতিক, অথচ সে সব দেশে সেখানকার স্থানীয় ভাষাই তো সমস্ত শিক্ষার বাহন। ভারতবর্ষের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় নয়? তাই বলে কি সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন বলে গণ্য হতে পারবে না? এ সব তর্কযুক্তির কথা পুনরুত্থাপন করতে চাইনে। শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বভারতীর পরিদর্শক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং রাজেন্দ্র-প্রসাদও এখানে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায় —ইংরেজিতে নয়, হিন্দিতেও নয়। আমাদেব আচার্যও কি বাংলায় ভাষণ দিতে পারেন না বলে দুঃখ করেন নি?* আর বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনও ইংরেজির ন্যায় বাংলাতেও প্রকাশের কথা সংসদকে অনুমোদন করিয়ে নেননি? সব চেয়ে বড় কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্যই তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার পূর্বেও দীর্ঘকাল (১৯২১-৫১) এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক বলেই স্বীকৃত ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথ এখানকার সভা-সমিতিতে বাংলাতেই ভাষণ দিতেন এবং আচার্যরূপে নির্দেশাদিও দিতেন বাংলাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও জানি শান্তি-

* আচার্যের ভাষণ বাংলায় দিতে পারেন নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত জওহরলাল। আর বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সুধীরঞ্জন।

নিকেতন-সমিতি তথা রবীন্দ্র-ভবন সমিতির প্রস্তাব গ্রহণ প্রতিবেদন প্রভৃতি কার্যকলাপ বাংলাতেই নির্বাহিত হত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যার শিক্ষাপীঠ বলে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতী অ-ভারতীয় ভাষার অঞ্চল গ্রহণ করল। স্বরাজ-সরকারের স্বীকৃতি পাবাব সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতীর এই ভাবান্তব দেখে কারও যে হাসি পেল না, তা দেখেই কাঁদতে ইচ্ছা করে। অথচ এর হাস্যকরতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন বহুকাল পূর্বেই।- -

"শিক্ষা সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করে. আরাম পাবেন, (ইংরেজি ভাষার) খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

—শিক্ষার বিকিরণ, (১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথের এ সব উক্তি চিরকালই আমার মনকে গভীর-ভাবে ও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। শুধু তাই নয়, সক্রিয়তাব দিকেও প্রেরণা দিয়েছে। তার একটু আভাস দিয়েছি পূর্বেই। ১৯৪২ সালে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় বাংলাভাষাকে যতটা সম্ভব স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করেছিলাম। অতঃপব ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন শেষবার এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে সোদপুরের ঠিকানায় চারটি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলাম। চারিটি প্রশ্নই ছিল বিশ্ব-ভারতীকে

ভাষা প্রয়োগের দিক নিয়ে। পত্র লেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তর পেয়েছিলাম, সেটি এখানে অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম।—

খাদী প্রতিষ্ঠান, সোদপুর,
পোষ্টমার্ক: ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপকা পত্র মিলা। ইসী বারেমেঁ মৈঁনে রথীবাবুকো লিখা হৈ। বিশ্বভারতীকে সব নিবাসীয়োঁকো বংগলা ঔর হিন্দুস্তানী জাননা হী চাহিয়ে। অংগ্রেজীকী সবকো আবশ্যকতা নহীঁ হোনী চাহিয়ে। বিদেশী জো আবে উনকোঁ লিয়ে প্রথম হিন্দুস্তানী সীখনেকো প্রবন্ধ করনা চাহিয়ে। বংগাল ছোড়কর জো অন্য প্রান্তসে আতে হৈঁ উনকো বংগলা সীখনেকো অনিবার্য হোনা চাহিয়ে—জৈসে বংগালীয়োঁকো হিন্দুস্তানী সীখনেকা হোনা চাহিয়ে। তব হী বিশ্বভারতী অপনে নামকে ঔর গুরুদেবকে নামকে যোগ্য বন সকতী হৈঁ। মেরী চলে তো বহাঁকে সব কারবারোঁকো হিন্দুস্তানী মেঁ রখুঁ আজ বহ সম্ভব ন হো তো বংগলা মেঁ রখুঁ—অংগ্রেজী মেঁ হরগীজ নহী।

চৌথা প্রশ্নকে বারেমেঁ মৈঁ সংপূর্ণ নাহিতী ন হোনেকে কারণ কুছ অভিপ্রায় দেনা নহীঁ চাহতা হূঁ।

—বাপুকে আশীর্বাদ

এর বাংলা অনুবাদ এই।—

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপনার পত্র পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি রথীবাবুকে লিখেছি। বিশ্বভারতীর সব নিবাসীরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী

জানা চাই। ইংরেজি সকলের পক্ষে আবশ্যিক হওয়ার দরকার নেই। বিদেশী যাঁরা আসবেন তাঁরা প্রথমে হিন্দুস্থানী শিখবেন। বাংলার বাইরের অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের পক্ষে বাংলা শেখা অনিবার্য হওয়া চাই, যেমন বাঙালির পক্ষে হিন্দুস্থানী শেখা চাই। তবেই বিশ্বভারতী নিজের নাম তথা গুরুদেবের নামের যোগ্য হতে পারে। আমার মত যদি চলত তবে ওখানকার সব কাজই হিন্দুস্তানীতে চালাতাম, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায় চালাতাম—ইংরেজিতে কখনোই নয়।

চতুর্থ প্রশ্নের বিষয় আমি সম্পূর্ণ অবগত নই বলে ও বিষয়ে কোনো অভিমত দিতে চাই না।

স্বাক্ষর ঃ 'বাপুকে আশীর্বাদ'

রথীবাবুকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তা বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে, ভাষা বিষয়ে নয়। আমার চতুর্থ প্রশ্ন কি ছিল তা এখন মনে নেই।

মহাত্মাজীর পত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর মতে (১) বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় ইংরেজির যে প্রাধান্য এখন বিদ্যমান তার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই, (২) অবাঙালি বাঙালি নির্বিশেষে এখানকার সকলেরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী জানা চাই, এবং (৩) এখানকার কাজকর্ম সমস্তই হিন্দুস্থানীতে, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায়, চালানো উচিত।

এখানে শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্পষ্টত কোনো উল্লেখ না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে,

তাঁর মতে এখানে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত হয় বাংলা, না হয় হিন্দুস্থানী, ইংরেজি যে নয় সে বিষয়ে তিনি সংশয়ের কোন অবকাশই রাখেন নি। তা ছাড়া বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় গুরুদেবের যে অভিপ্রায় নিহিত ছিল তাকেই যে এখানে প্রাধান্য দিতে হবে তারও স্পষ্ট আভাস রয়েছে ওই পত্রেই। আর শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে এখন আর কারও সন্দেহ নেই।

৩

হিন্দুস্থানী সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিমত আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ স্থলে তাঁর সেই অভিমত স্মরণ কবা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।—

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের অল্পকাল পরে যখন হিন্দি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা বলে গণ্য করবার দাবি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে হিন্দি-ভাষার পক্ষে উক্ত দাবি সম্পর্কে যা বলেন তা এই।—

এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।·····

য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল

বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকের দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে মহত্ত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটেনি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনও ঘটতে পারত না। আজকের দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই, কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবেব যে বিরাট্ আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেকটি দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞান-সমবায়ে।

আমাদের দেশেও এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না, হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা।......

এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষাবৈচিত্র্যের উপর ষ্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজপথের পথ সমভূমি করতে চায়।…বাইরের যে এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব। আর অন্তরের যে এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর একটা হল পঞ্চায়েত।

—সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্যের পথে (১০২৯)

এই অভিভাষণের পনর বছর পরে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ আর এক বার এই সতর্কবাণী পুনরুচ্চারণ করেন।—

“হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্য একভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

“রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

“এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে,

এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

"তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির একভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে, সেদিন য়ুরোপের বড়দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়দিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

—বাংলাভাষা পরিচয়, (১৯৩৮) ৮ম পরিচ্ছেদ

অনুরূপ কথা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্যও উচ্চারণ করেছিলেন।—

একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়-

সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই দেশীয় ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রেব সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে।·· ···বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না, সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়াব মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজেব ভাষাতেই। এইজন্যই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সবজনের অন্তরেব সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধাব করেছে।

—শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৯৩৩)

বিদেশী বা স্বদেশী, ইংরেজি বা হিন্দি, কোনো এক ভাষাব যোগে ভারতবর্ষে শিক্ষা, চিন্তা ও বিদ্যার ঐক্যবিধানের কল্পনা অবাস্তব, কেননা তা মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, ইতিহাস-বিরুদ্ধ ; ভারতবর্ষের সবগুলি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের সমবায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেয়ালি-উৎসবের ব্যবস্থা করলে তবেই ভারতীয় চিত্তের ঐক্য উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট অভিমত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাকে একভাষার একাতপত্র আধিপত্যের আওতায় আচ্ছন্ন

করে নয়, প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষারই স্বতন্ত্র ও অপ্রতিহত প্রকাশের ও সমবায়ের দ্বারাই ভারতীয় ঐক্যের বিধান করতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

পরম আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে. এল. শ্রীমালী রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সমীচীনতা সর্বতোভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর অন্তরের নিঃসংশয় অনুমোদনের কথাও অকুণ্ঠিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অত্যল্পকাল পূর্বে বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন-বিভাগের বাৎসরিক উৎসব (৬ ফেব্রুআরি ১৯৬১) উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে বলেন—

The multiplicity of languages need not frighten us. The Constitution recognises the right of the people speaking the same language to organise themselves as groups and units and preserve their culture and language.······Tagore was fully aware of the difficulty inherent in the situation when he said, "We must bravely accept the inconvenient fact of the diversity of our languages and at the same time know that a foreign language like foreign soil may be good for pot culture but not for cultivation which is widely and permanently necessary for the maintenance of life".

Tagore aimed at a real unity in the country through harmonisation of various linguistic

and cultural groups and not at dead uniformity which only leads to lifelessness. The Indian civilisation will get richer and its intellectual unity will be based on firmer grounds if the different linguistic groups are allowed to have free expression and to make their unique contribution to the common culture. The ties of friendship thus established will be stronger than any unity imposed from outside by artificial methods.

নাম করে না বললেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সমগ্র দেশের উপরে হিন্দি বা ইংরেজি চাপিয়ে দিয়ে ঐক্যবিধানের যে প্রয়াস তা তাঁর মতে কৃত্রিম ও অকাম্য। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তী।

ভারতীয় ঐক্যবিধান ও হিন্দিপ্রবর্তন-প্রসঙ্গে মনস্বী শিক্ষা-নায়ক দেশহিতব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করা অনুচিত হবে। এ বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ অভিমত এই।—

সকলকে এক অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদানপ্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে।···তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব স ঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে।······ Unification of language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচল আবশ্যক।......তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দি ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজি ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সর্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজি ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।...

সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত তথায় তাহা সেইরূপেই থাকুক, সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক।...... তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশ-বাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক।...এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।

—ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, জাতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সংস্কৃতিগত এই ঐক্যসাধনার কথা আশুতোষ ব্যক্ত করেন ১৯১৯ সালে হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ দান উপলক্ষ্যে। ওই ভাষণেই তিনি বলেন, "ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।" বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করে তিনি তাঁর এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার সাধনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। অকাল-তিরোধানের ফলে তাঁর সে ব্রত আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই মনস্বী চিন্তা-নায়কের ভারতধ্যান ও ভাষাসমস্যার সমাধান সম্পূর্ণরূপেই এক। 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব' উপলব্ধি করে এবং উক্ত 'ভারতের চিত্তমুক্তি' সাধনব্রতে তাঁর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করে আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। দীর্ঘকাল পরে আজ স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালীর ভাষণে আশুতোষ-রবীন্দ্র-স্বীকৃত ভারতীয় ঐক্যসাধনার আদর্শগত উক্ত বাণীই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আশা করতে পারি, হিন্দি-আধিপত্যের দ্বারা ভারতবর্ষকে একাকারত্ব দানের ভ্রান্ত পথ অদূর ভবিষ্যতে পরিত্যক্ত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সংস্কৃতি-সমবায়ের দ্বারা ভারতীয় চিত্তের ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সত্য-আদর্শ অনুসৃত হবে আর তখনই বিশ্বভারতী জাতীয় চিত্তসমবায়ের সাধনায় রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে অগ্রণীত্ব লাভের সুযোগ পাবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্র বিশ্বভারতীতে, প্রধানত বাংলাভাষারই সাধনা করতে হবে দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করে তোলবার জন্য, এই ছিল তাঁর অন্তরের অভিপ্রায়। হিন্দি বা হিন্দুস্থানী যখন ভারতবর্ষের সরকারী ভাষা বলে কার্যত স্বীকৃত হবে তখন এখানেও ওই ভাষার একটা দীপ জ্বালাতেই হবে কিন্তু তার স্থান হবে বিশ্বভারতীর দেউড়িতে, অন্দরে নয়; ঘরের মধ্যে জ্বলবে বাংলাভাষার প্রদীপ, সরকারী দীপের তেল জোগাবার খাতিরে ঘরের দীপে তেলের কমতি ঘটানো চলবে না। অর্থাৎ এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থা চলবে বাংলাভাষারই যোগে, সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দি শেখবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কিন্তু হিন্দির চাপে বাংলার সংকোচন ঘটানো চলবে না।

৪

আবার মূলপ্রসঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষার বাহন-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকার করবার জন্যে দেশের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যে একক ছিলেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠও বারবার ধ্বনিত হয়েছে অব্যর্থ ও

কঠিন ভাষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হৌসের মহতী সভা ইংরেজির যূপকাষ্ঠে 'অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে' চরম সদ্‌গতির অধিকারী হয়েছে, এমন কঠোর উক্তি করতেও বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হননি। (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, পৃ ৬১৬-১৭) এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি করব না।

মধুসূদনকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিহিত করেছিলেন 'ডাহা ইংরেজ' বলে। এই 'ডাহা ইংরেজ'কেও একদিন (১৮৬৫ জানুআরি ২৬) আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. ......If there be any one among us anxious to leave a name behind him, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe, but when we speak to the world, let us speak in our own language......I should scorn the pretensions of that man to be called educated who is not the master of his own language.........

Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as owing to early defective education,

know little of it and learnt to despise it, are miserably wrong.

—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ২৩, পৃ ৭৫-৭৬

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মধুসূদনও আমাদের শিক্ষার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। এখানে শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত না হলেও মাতৃভাষার চর্চাই যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং মাতৃভাষার যোগেই বিদ্যার প্রকাশ যে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য, এ বিষয়ে মধুসূদনের মনে লেশমাত্র সন্দেহও ছিল না। তাঁর ১৮৬৫ সালের উক্তিকে যে ১৯৬১ সালেও পুনরাবৃত্তি করতে হল সেটাই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করবার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে যারা স্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে, যতদূর জানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামই সর্বাগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েক বৎসর পূর্বেই, ১৮৮০ সালে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'কালেজী শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, আজও তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই।—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজ হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল

জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম, তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজী শিখ না কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজী মুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরাজী শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না, শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অল্প জ্ঞান হয়।"

—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ সাল

এর টিকা বা ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। এত অল্প পরিসরে ও এমন সরল ভাষায় আমাদের শিক্ষাসমস্যাকে এমন সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহ্য রূপে আর কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। এই উক্তি প্রকাশের পরও আশি বৎসর হতে চলল, কিন্তু আজও আমাদের চৈতন্য হল না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়।

ইংরেজি ভাষার আলেয়ার পেছনে এক সময়ে মধুসূদন

ছুটেছিলেন প্রাণমন নিয়ে। কিন্তু তাঁকেও একদিন নিবৃত্ত হয়ে বলতে হয়েছিল—

> হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
> তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি'
> পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

অবরণ্যে বরণ করার অনুতাপে অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে বল্‌তে হয়েছিল, "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।" আমরা আজও পরদেশে পরধনলোভে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেই চলেছি। কিন্তু আশার ছলনে ভুলে কি ফল লাভ করলাম, সেকথা ভাববার অবকাশ কি আমাদের কখনও হবে না ?

সুখের বিষয় স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন। তাঁর দ্বিধাহীন চিত্তের বলিষ্ঠ অভিমত এই।—

It is a great irony of fate that after independence when we have full freedom to develop our languages,...we are clamouring for the retention of English not only as an alternative official language but also as a medium of instruction in our universities. Gandhi, Tagore and Radhakrishnan, and all our great thinkers who have thought seriously about the problems

of Indian education have explained in unequivocal terms that a foreign language cannot be the true medium of education...........

He (Tagore) had the courage of his conviction and took steps to make the mother tongue the medium of instruction *in his institution.* It was his firm belief that unless the mother tongue *or the regional language* became the medium of education *and culture* the creative urges and thoughts of our people could not find full and free expression. (বক্রলিপি লেখকের)

—শ্রীনিকেতন-ভাষণ (৬ ফেব্রুআরি ১৯৬১)

এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের, বিশেষতঃ শেষ বাক্যটির, সার্থকতা সংশয়াতীত এবং বহুমুখী। যাঁরা ইংরেজিকে সরকারি ভাষা তথা শিক্ষার বাহনরূপে রাখার কিংবা নিজ সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী, এই অভিমত তাঁদের সকলেরই বিশেষভাবে চিন্তনীয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বভারতীর শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এই উদ্‌ধৃতিটিতে। তৃতীয়তঃ, বিশ্বভারতীর যে-সব ছাত্রের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাঁদেরও শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়া উচিত তারও নির্দেশ রয়েছে the mother tongue or the regional language এই উক্তিটির মধ্যে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখন এখানে বহু অবাঙালি ও অভারতীয়ের সমাবেশ ঘটেছিল তখনও তিনি তাঁর সরকারি নির্দেশ ও ভাষণ প্রভৃতি দিতেন বাংলাতেই, সরকারি প্রস্তাব ও প্রতিবেদনাদির

বাহনও ছিল মুখ্যতঃ বাংলা। চতুর্থতঃ, শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বাহনও হওয়া চাই মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

শিক্ষামন্ত্রীর উক্ত অভিমতের তাৎপর্যবিশ্লেষণে আর অগ্রসর হওয়া নিস্প্রয়োজন। তবে ইস্কুলের শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের আর একটু পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চশিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ; কিন্তু ইংরেজির সহায়তা ছাড়া, (অন্ততঃ বর্তমানকালে) যে উচ্চশিক্ষাই হতে পারে না সে বিষয়ে দুই মত নাই। সুতরাং উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজিশিক্ষার ভিত্তিপাত করতে হবে ইস্কুলেই। এইজন্যই উচ্চশিক্ষালিপ্সুদের ঝোঁক ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করার দিকে এবং তাদের ভিড় বিলিতি ধাঁচের ইস্কুলের প্রাঙ্গণে। কিন্তু তাতে তাদের শিক্ষা হয় বিকৃত এবং চিত্তের বিকাশ থাকে অসম্পূর্ণ। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা অথচ অযথা সময় ও শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে ভালো করে ইংরেজি শেখা চাই, নতুবা উচ্চশিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয় অভিমত। আর, মাতৃভাষায় যথোচিত অধিকার লাভই সহজে ও অল্প সময়ে ইংরেজি শেখার প্রকৃষ্টতম উপায়, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবু এ স্থলে আরও দু একটি উক্তির উল্লেখ অনুচিত হবে না। কাশী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে (১৯২৩) তিনি বলেন—

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।···আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি—আমি দেখেছি তাদেরই ইংরেজি শেখানো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না তাকে ইংরেজি শেখাই কি অবলম্বন করে।······নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্যভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

—সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্যের পথে (১৩২৯)

এই মত প্রকাশের পরের বছর (১৯২৪) তিনি তাঁর দৌহিত্র নাতীন্দ্রনাথের (১৯১২-৩২) শিক্ষা সম্বন্ধে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে যা লেখেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনে রাখা উচিত তখন নীতীন্দ্রনাথের বয়স বারো বছর। তাঁর উক্তি এই—

নীতু ভালো আছে তো? ওর পড়াশুনো কেমন চলচে? দীর্ঘকাল বাংলা শেখা বন্ধ হয়ে থাকলে ওর পক্ষে ভালো হবে না। এই কাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে, আর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি না শিখে বাংলা শিখেছিলুম। তাতেই আমার মনের ভূমিকা পাকা

করে তৈরী হয়েছিল, সেই ভূমিকার উপর অতি সহজেই প্রায় বিনা চেষ্টায় ইংরেজির পত্তন হতে পারল।

—দেশ, ১৩৬২ পৌষ ৮, পৃ ৫৬২

মাতৃভাষায় শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না করে ইংরেজি শেখানো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। আর মাতৃভাষার যোগে মনের ভূমিকা পাকা করে তৈরি হলে সে ভূমিকার উপরে ইংরেজির পত্তন করা সহজ হয়, নতুবা ইংরেজি শেখানোও দুঃসাধ্য হয়—এই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত।* এই কথা আজ আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ করবার দিন এসেছে।

৫

শিক্ষার ফল সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তারও বাহন হওয়া চাই মাতৃভাষা, অন্ততঃ পক্ষে আঞ্চলিক ভাষা, রবীন্দ্রচিন্তার এই দিক্‌টাও শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অধিকতর বিশ্লেষণ নিস্প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষানায়ক আশুতোষের দু-একটি উক্তি উদধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম,

* দীর্ঘকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে (১৮৯২)। 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৮৯৫) এই মতের স্পষ্টতর প্রকাশ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য' (শেষ সংস্করণ) পৃ২৮৯-৯০।

যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতে লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া দেশের ধন বিদেশে বিলাইয়া দিব না,…এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে।

—বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৩১৬), জাতীয় সাহিত্য

পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা কিছু উত্তম, যাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।……

ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীতভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না।…প্রাচীন জাপান এই উপায়বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।

—জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি (১৯১৬), জাতীয় সাহিত্য

যে সময়ে আশুতোষ এসব উক্তি করেন, প্রায় সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশিত

হয়। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ, এই দুই শিক্ষাব্রতী চিন্তানায়কের কণ্ঠ থেকে প্রায় একই সময়ে অবিকল এক বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। আর মন্তব্য অনাবশ্যক। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁদের এই উদাত্ত আহ্বানবাণী ধ্বনিত হবার পরে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও আমরা তাঁদের প্রদর্শিত পথে অতি অল্পই অগ্রসর হতে পেরেছি। কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন, আমাদের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত, এবং সে পথে আর কোনো বাধাই নাই একমাত্র আমাদের অন্তরের সুচিরপোষিত সংস্কার ছাড়া।

———

শিক্ষার লক্ষ্য

মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে দেশের অবস্থা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই বলতে হয়েছিল, "ভাগ্য-চক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?" এই উক্তির ছয় বৎসর পরেই ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা ইংরেজকে ভারতসাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হয়েছে। তার ফলে স্বাধীন ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ওই লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। এই আবর্জনার স্বরূপ কি, তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ফুঠে উঠেছে সবচেয়ে স্পষ্টরূপে। "সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ।" অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব এবং তারও উপরে, নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, স্বাধীনতার বিনিময়ে এই আমরা পেয়েছি ইংরেজের হাত থেকে। স্বাধীন ভারতের সামনে রয়েছে এই পঞ্চবিধ সমস্যার গুরুতর প্রশ্ন; এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতাই নিরর্থক হয়ে যাবে।

এই সমস্যার কঠিন রূপ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে দীর্ঘকাল ধরেই পীড়িত করছিল। তাঁরই উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

নিভৃত সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হ'তে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারত-বর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।

—সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর

নিভৃত সাহিত্যের পরিবেশ থেকেই তিনি একদা শুনতে পেলেন—

কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।

তিনি দেখতে পেলেন—

বড় দুঃখ বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

ব্যথিত কবিপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল এর প্রতিবিধান করতে।

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,
তবে তাই কর আজি দান।

প্রাণের বিনিময়ে তিনি যে প্রতিবিধান করতে বদ্ধপরিকর হলেন তার স্বরূপ কি? অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, স্বাস্থ্যহীনকে স্বাস্থ্য বিতরণে তিনি ব্রতী হননি। তিনি সঙ্কল্প করলেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

সমস্ত দেশের হয়ে তিনি ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন, তাতেও ওই একই কথা ধ্বনিত হয়েছে।—

দৈন্য জীর্ণ বক্ষ তার মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনিপাতে।

ছায়াভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

অতি পরিচিত কবিতা ও গানের এই নিত্য-আবৃত্ত অংশ-গুলি উদ্ধারের উদ্দেশ্য এই যে, নিত্য-আবৃত্ত বলেই অতি-অভ্যাসের ফলে এগুলির যথার্থ তাৎপর্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে দেশজোড়া অজ্ঞানতার অবসাদ এবং তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় জ্ঞানের জাগরণ। 'যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে'—এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-অবিশ্বাস ও পুঞ্জিত অবসাদ দূর হয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হবে আশা এবং কণ্ঠে ধ্বনিত হবে ভাষা। এক আশা ও এক ভাষার শক্তি নিয়ে 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়ালেই' সমস্ত ভয়ের অবসান ঘটবে; কেননা সে ভয় বাস্তব নয়, সে 'ছায়াভয়' মাত্র; 'যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' এক কথায় তাঁর মতে আমাদের সমস্ত সমস্যা ও দুঃখ দুর্গতির মূলে রয়েছে দেশব্যাপী অজ্ঞতা এবং তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় জ্ঞানের বিস্তার।

ছন্দোবদ্ধ কবিতায় দেশের মূল সমস্যা ও তার সমাধানের আভাস পেলাম। নানা সময়ে তাঁর অজস্র গদ্য রচনাতেও ঠিক ওই কথাই প্রকাশ পেয়েছে নানা আকারে। তার দু একটি উক্তি উদ্ধার করছি।—

আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা—যে বুদ্ধির রাস্তায় মানুষ

পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে, সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা। বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলেব সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা।...সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা ক'রে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় ক'রে বসে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ইংরেজ এসে পূর্ণ করেছে।...বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদেব অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাঁদের ঢেঁকিলীলার অবসান হবে না ; সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে—এইমাত্র প্রভেদ।

—সমস্যা, কালান্তর

অর্থাৎ 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' গীতার এই অমোঘ বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ বারংবার আমাদের শুনিয়ে গেছেন। এই যে দেশ-জোড়া অবুদ্ধিজাত অকল্যাণ, তার প্রতিবিধান কি ? এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করা যাক্।—

আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করেছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করেছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল ; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন—শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ; অবুদ্ধির প্রভাবে

বাস্তব জগতকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে সুবুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখম আমাদের সমস্যা, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

—সমাধান, কালান্তর

বোঝা যাচ্ছে—যে-শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে—এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মত। আমরা রবীন্দ্রনাথকে সাধারণতঃ কবি অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের উপাসক ব'লেই জানি। এই জানা অসম্পূর্ণ জানা। তাঁকে সমগ্রভাবে জানতে গেলে দেখা যাবে, তিনি একদিকে যেমন সৌন্দর্যের পূজারী, অপর দিকে তেমনি বুদ্ধি-মহিমার পতাকাধারী। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন, তাই স্মরণ করি।—

আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।···তাই ধী ও আনন্দ, এই দুই শক্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করছি।

—আত্মপরিচয় (১৩৫০), পৃঃ ১১৯

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপ। তিনি যেমন আমাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ সঞ্চারের সাধনা করে গেছেন, তেমনি আমাদের অবুদ্ধি-আচ্ছন্ন জাতীয় জীবনে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠার সাধনাও করেছেন সমভাবেই। তাঁর জীবন সমগ্রতার আদর্শে ধীশক্তি আনন্দশক্তির তুলনায় গৌণ ছিল না। সক্রিয় বুদ্ধি চালনার প্রত্যক্ষ ফল দুটি, বিচার শক্তির উন্মেষ এবং বিচারলব্ধ জ্ঞান। আমাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে শাস্ত্রের বিধান ও ধর্মের অনুশাসন। ধর্ম ও শাস্ত্রের শাসন, এক কথায় আপ্তবাক্য জাতিগতভাবেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পিষ্ট ও নিস্ক্রিয় করে ফেলেছে। এই সজীব জড়ত্বের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল সবচেয়ে প্রবল। তাঁর প্রতিবাদ এই—

যদি বল, এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তাহলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে, তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন।......

বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সঙ্কীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তি-বিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে, সেই দেশজোড়া মানুষপেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারোর চেয়ে খাটো? বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে এত বড় সুসম্পূর্ণ

সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনো দিন আব কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানিনে।···

বুদ্ধির জায়গায় বিধি এবং আত্মশক্তিব জায়গায ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা কবে বলেই দুঃখ পায়, সেকথা মনের জড়ত্ববশতঃই বোঝে না।

—সমস্যা, কালান্তব

যুক্তি-বিরুদ্ধ নির্বিচার আচার-পরায়ণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-নাথের এই যে প্রতিবাদ, তার মূলে নিহিত ছিল তাঁর আবাল্য শিক্ষার মধ্যে এবং তৎকালীন কালধর্মের মধ্যেই। এই কালধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন,—

সভ্যতাব যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন।···এই আচারের ভিত্তি কতকগুলি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশঃ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সেই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।·····আমাদের পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোক-

ব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম।

—সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর

এই যে প্রচলিত সংস্কার, নিরর্থক প্রথা ও নির্বিচার আচার-পরায়ণতার দাসত্ব, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আচারের স্থলে বিচার, প্রথার স্থলে স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কারের স্থলে বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের শিক্ষার মূল কথা। দেশের সর্বত্র যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সাধনা করে গিয়েছেন তারও মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের জাতীয় চিত্তে মনু-স্বীকৃত আচারপরায়ণতার স্থলে স্বাধীন বিচার বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাঁর গদ্য পদ্য অজস্র রচনাতেই আচারনিষ্ঠার পরিবর্তে বিচারনিষ্ঠাকে জাগ্রত ও উদ্যত করে তোলবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে।—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—···
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

এই ছিল ভগবানের কাছে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা।

ঋগ্‌বেদের যুগে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ ঘটেছিল, তার তৎকালীন আশ্রয়স্থল ছিল বহুখ্যাত সরস্বতী নদীর তীরভূমি। সে যুগে এই নদীর জলরাশি ছিল বিপুল ও গভীর, উক্ত নদীর নামেই তার সে পরিচয় সুস্পষ্ট।

এই সরস্বতী তখনকার দিনে হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে (অর্থাৎ আরব সাগরে) তার অগাধ জলরাশি

ঢেলে দিত। পরবর্তীকালে রাজপুতনার মরুবালুরাশি অগ্রসর হয়ে সরস্বতীর স্রোতঃপথকে গ্রাস করে ফেলেছিল। যে স্থানে সরস্বতীর জলরাশি মরুভূমিতে বিলীন হয়ে গেল, মনুসংহিতার কালে তা 'বিনশন' নামে পরিচিত হত। তবু মনুর যুগে সরস্বতীর জল সমুদ্রের দিকে অর্ধপথ অগ্রসর হয়ে তারপরে মরুবালুতে বিনাশপ্রাপ্ত হত। পরবর্তীকালে সে জলধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে বর্তমান সময়ে প্রায় সম্পুর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে সরস্বতী ছিল ভারতীয় বিদ্যার প্রতীক, যার জন্য তার অপর নাম হয়েছে 'ভারতী', মরুভূমির উষরতার মধ্যে তার এই যে বিনাশপ্রাপ্তি, এ যেন একটি ভৌগোলিক ঘটনা মাত্র নয়, এ যেন বস্তুতই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে মনু কথিত আচারের মরুভূমিতে ভারতীয় স্বাধীন চিন্তাস্রোতের বিনাশ প্রাপ্তির প্রতীক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগে যে স্বাধীন চিন্তা সত্যোপলব্ধির মহাসমুদ্রের দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ও আচার-নিষ্ঠার অসার্থকতার মধ্যে তার গভীর স্রোত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের জ্ঞান-সরস্বতীকে আজ যেন এক দেশব্যাপী 'বিনশন' প্রায় সম্পুর্ণরূপেই গ্রাস করে ফেলেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।

ভারতীয় চিত্তস্রোতের যে ধারা বুদ্ধিহীন বিচারহীন যুক্তি-বিরুদ্ধ সংস্কার প্রথা ও আচারের মরুপথে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে, তিনি বিশ্বাস করেন তা একান্তভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি, তাব পুনরুদ্ধারের আশা একান্তই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের চিত্তসরস্বতীকে শাস্ত্রবিধান, ধর্মানুশাসন তথা লোকাচারের মরুময় বিনশন গ্রাস থেকে উদ্ধার কবে তাকে আপন পথে প্রবল বেগে প্রবাহিত করা এখনও সম্ভব বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আমাদের চিত্তভারতীব এই পুনরুদ্ধারকেই তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য করে গিয়েছেন। সে সাধনারই কেন্দ্র হচ্ছে বিশ্বভারতী।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তাবে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ ’পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে ॥

—দুই উপমা, চৈতালি

তাই তো তিনি তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার এবং আচারপ্রথা-সংস্কারের কলেচলা তাসের দেশে স্বাধীন জীবনের গতিসঞ্চারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতা মানে শাস্ত্র, আর শাস্ত্র হচ্ছে ধর্মের বাহন —যে ধর্ম মানুষকে বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা দান করে সে ধর্ম নয়, যে ধর্ম দেশাচার ও লোকাচারের অসংখ্য বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ করে মানুষকে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব দান করে সেই ধর্মের বাহন। তাই গতিশীল নিত্য সক্রিয় সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের সাধক রবীন্দ্রনাথ উক্ত শাস্ত্র ও ধর্মের সম্বন্ধে এমন কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। যে ধর্ম-শাস্ত্র স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিরোধী, সে শাস্ত্রকে তিনি অস্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। যে ধর্ম মানুষের মনকে সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখে, সে ধর্মকেও তিনি বারংবারই কঠিনভাবে আঘাত করেছেন। কেননা তাঁর মতে এই আচারগত ধর্মের বাইরে আমাদের জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। 'এই কারণে এরা ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই জন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের নিত্য সত্যের চেয়ে বাহ্য বিধান, কৃত্রিম প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।' যে ধর্ম মানুষকে সত্য ও কল্যাণের ভূমিতে একত্র মিলায়, সে ধর্ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। যে শাস্ত্রীয় ধর্মের আমরা বশীভূত, সে সঙ্কীর্ণ ধর্ম একদিকে আমাদের মধ্যে সংখ্যাতীত খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, অপর দিকে সত্য ও কল্যাণ থেকে আমাদের পৃথক করে রাখছে। অথচ এই সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রীয় ধর্মের মোহ অতি প্রবল, সে মোহের জাল

ছিন্ন করা অতি দুঃসাধ্য। এই ধর্মের মোহকে রবীন্দ্রনাথ বার বার অতি কঠিন ধিক্কার দিয়ে গেছেন। তাঁব কণ্ঠে অতি তীব্রভাবেই ধ্বনিত হয়েছে—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার-বিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা,
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

—ধর্মমোহ, পরিশেষ

ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে এই ধর্মই যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ ঘটিয়েছে—শুধু ভেদ নয়, বিরোধও ঘটিয়েছে। এই ধর্মই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, আমাদের বিচারশক্তিকে নিস্তেজ করে দিয়ে সমগ্র দেশকে নিরন্তর অকল্যাণেব পথে টেনে নিয়েছে। এই ধর্মের অভিশাপ থেকে আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। এই ধর্মই আজ চিরন্তন ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের পারস্পরিক হানাহানির গ্লানির মধ্যে অবতীর্ণ করেছে। এই ধর্মবেশী অবুদ্ধি আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকেও নিরর্থক করে দিয়েছে। আচার ধর্মগত অবুদ্ধির ছিদ্রপথে অজস্র অকল্যাণ প্রবেশ করে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমিকেই জীর্ণ করে ফেলছে। আচারধর্মের প্রভাবে আমাদের মনের চলৎশক্তিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফলে আচারের অজস্র বিভিন্নতা আমাদের সমাজদেহে অসংখ্য ফাটল সৃষ্টি করেছে, আর বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষ শাস্ত্রগত ধর্ম যুগ যুগ ধরে তার ফাটলে ফাটলে শিকড় চালিয়ে দিয়ে সমাজবন্ধনকে শিথিল করে এনেছে। এই শিথিল-গ্রন্থী সমাজদেহ নিয়ে আমাদের পক্ষে ঝড়ঝঞ্ঝার আঘাত সহ্য করা কঠিন হয়েছে। তাই রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা পেয়েও আমরা তাকে যথোচিত বা ইচ্ছামতো পরিমাণে কাজে লাগাতে পারছিনে। বরং যখনই কোনো বিপদের সম্মুখীন হই, তখনই ওই সামাজিক দুর্বলতাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় সমস্যা, সব চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাতীয় নেতারা বহুকাল ধরে বহুভাবে দেশের মধ্যে সজীবতা ও সক্রিয়তা সঞ্চার করে তাকে স্বাধীনতালাভের উপযোগী করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সব সমস্যার মূলে রয়েছে যে অবুদ্ধি, শাস্ত্র ও ধর্মগত বিধিনিষেধ ও আচার প্রথাকে নির্বিচারে মেনে নেবার যে মজ্জাগত প্রবণতা—যে প্রবণতা পরবশ্যতা স্বীকারেরই নামান্তর—সেই মূলগত দুর্বলতা অপসরণে কেউ প্রয়াসী হন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সারাজীবন ধরেই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্গতির মূল কারণের প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন এবং সে সাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে আমাদের মজ্জাগত ভেদবুদ্ধি ও সামাজিক অনৈক্য, আর তারও হেতু হচ্ছে শাস্ত্রগত আচারধর্ম পালনের আবহমান-কালীন অন্ধ অভ্যাস। তিনি বুঝেছিলেন এর একমাত্র প্রতিকার নির্মোহ নির্মল বুদ্ধির জাগরণ এবং সে জাগরণ যথার্থ শিক্ষা-সাপেক্ষ। তাই দেশের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার প্রসারকেই তিনি জীবনের সাধনা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে সাধনারই কেন্দ্র শান্তিনিকেতন।

১৮৮৩ সালে, কংগ্রেসের জন্মেরও পূর্বে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার ব্যর্থতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর তৎকালীন মন্তব্য আজও স্মরণীয়, আজও তার উপযোগিতা অব্যাহত আছে।—

যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর জন্য

আগে হইতে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতাম ও গভর্ণমেণ্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপে প্রস্তুত হইবার উপায় কি? তাহার এক উত্তর আছে,, বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয়, তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষাব প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজী লিখিলে কিংবা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলে এটি হয় না। ইংবাজীতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালাসাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দু'টি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ? সমস্ত জাতিকে একবাব দাবী করিতে শিখাও। কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political Agitation-এর দ্বারা হইবে না।

—ভারতী, ১২৯০ কার্তিক, পৃ-২৯৩

১৮৮৩ সালে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই অভিমতই পোষণ করেছিলেন। আমাদের শিক্ষার অযথার্থতা, অগভীরতা ও অব্যাপ্তি অপনয়নের সাধনাই তিনি করে গিয়েছেন সারাজীবন।

শিক্ষার দুই দিক। এক দিক বিনাশ ও সংস্কারের, আর এক

দিক সৃষ্টির। এক দিকে অবুদ্ধিজাত সংস্কার ও অন্ধ আচারের 'অচলায়তন' বা 'ধর্মকারা'র অপসারণ, অপর দিকে সৃষ্টিপরায়ণ বুদ্ধিজাত জ্ঞানদীপ্তির প্রসারণ। তাই তো রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের তীব্র বেদনায় প্রার্থনা করেছেন—

হে ধর্মরাজ,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

এ প্রার্থনায় সর্বান্তঃকরণে যোগ দেবার সময় বয়ে যাচ্ছে।

———

শিক্ষা সমস্যা

১

স্বাধীন ভারতের সামনে অনেক সমস্যা। অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, জীবনধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য এই চারিটি বস্তুর অভাব আজ সমস্ত জাতিকেই জীর্ণ করে ফেলেছে। তার উপরেও অত্যন্ত উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের আত্মবিচ্ছেদ; সে বিচ্ছেদ যেমন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, তেমনি প্রদেশে প্রদেশে। সব সমস্যারই সমাধান চাই, নতুবা জাতিগতভাবে আমরা বাঁচব না। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, অন্নবস্ত্রের সমস্যা আপাতিক, তার প্রত্যক্ষ কারণ ও প্রতিকারের উপায় সুদূর-প্রসারী নয়; কিন্তু শিক্ষার সমস্যা গভীরতর এবং চিরন্তন। বস্তুতঃ শিক্ষা সমস্যার প্রতিকার না হলে অন্য কোনো সমস্যারই স্থায়ী বা যথার্থ প্রতিকার সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা-দৈন্য যথার্থভাবে ঘুচলে অন্য সব অভাবেরই অবসান ঘটবে। কেননা অন্ন-বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সমস্যার মূলেও অশিক্ষারই প্রভাব, আত্মবিচ্ছেদ সমস্যা তো অশিক্ষা এবং কুশিক্ষারই প্রত্যক্ষ পরিণতি।

বর্তমানে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই গুরুতর রূপ ধরেছে এবং তার আশু প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব দৈন্যের মূলে যে শিক্ষাদৈন্য, তার প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়াস তেমন প্রবল নয়। অথচ শিক্ষার মান অন্ততঃ বাংলা দেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে। তথ্য-

তালিকা দিয়ে একথার সত্যতা প্রমাণ করবার প্রয়োজন দেখি না; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের কথা স্মরণ করলেই এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। অবশ্য আমাদের শিক্ষা-সমস্যার প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই হচ্ছে না একথা বলছি না। রাধাকৃষ্ণন কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। বাংলা দেশে দেখি মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলির সুষ্ঠুতর পরিচালনার জন্য এগুলিকে বিশ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষা সঙ্ঘেব নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে, এই সঙ্ঘের কার্যাবলীব কথা মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং প্রণালীব পরিবর্তনসাধন সম্পর্কেও কিছু কিছু সক্রিয়তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইদানীং রবীন্দ্রকল্পিত শিক্ষায়াতন বিশ্বভারতীও কেন্দ্রীয় সরকার-স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। তথাপি একথা মানতে হবে যে, এসব প্রয়াসের কোনোটাই এখনও সফলতা লাভ করেনি, আশু ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের এই চার বৎসরের ইতিহাসকে বোধকরি কিছুতেই উৎসাহজনক বলে স্বীকার করা যায় না। রাশিয়ায় অনুরূপ অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার কতখানি উন্নতি হয়েছিল, তার সাক্ষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পুস্তকে।

আজ আমাদের দেশে সর্বমান্য শিক্ষা-নায়কের একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথ বা আশুতোষের ন্যায় শিক্ষানায়ক বিদ্যমান থাকলে আজ আমাদের এত দুর্ভাবনার কারণ থাকত না।

তাহলেও আমাদের নিরাশ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও তো চলবে না। এই অবস্থায় সকলের সমবেত প্রয়াস অত্যাবশ্যক। শিক্ষাব্রতীরা এবং যারা শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন, তাঁরা সকলেই যদি শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হন তাহলে এই সমস্যার মীমাংসা সহজতর ও সুষ্ঠুতর হতে পারে। বহু আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলে আমাদের চিন্তা সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারবে এবং শিক্ষার বাঞ্ছিত আদর্শ ও প্রণালী ক্রমশঃ আমাদের অধিগত হবে। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষা সমস্যার দু-একটি দিক নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষা-সমস্যা মূলতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষার অবাস্তবতা বা অপূর্ণতা, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-বিস্তারের অভাব। যে শিক্ষানীতি এতদিন যাবৎ আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে, তার লক্ষ্যগত সঙ্কীর্ণতার ফলেই এই দ্বিবিধ ত্রুটির উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক সভ্যদেশেই শিক্ষানীতির লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে শিক্ষার্থীকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী করে গড়ে তোলা। ফলে সে সব দেশে শিক্ষার অবাস্তবতা বা অবাপ্তি ঘটতেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশী রাজ্যচালকদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য স্বভাবতঃই ছিল স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী। তাদের শাসন বা শোষণযন্ত্রটিকে তাদেরই স্বার্থের অনুকূলে সচল রাখার উপযোগী রাজভৃত্য গড়ে তোলাই ছিল তাদের শিক্ষানীতির প্রথম লক্ষ্য, দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল অবশিষ্ট

মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকে স্বদেশের যথার্থ কল্যাণের প্রতি আচ্ছন্ন করে রাখা, আর তৃতীয় লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী অগণিত জনসাধারণকে নীরন্ধ্র অশিক্ষার মধ্যে অবারিতভাবে শাসিত ও শোষিত হবার উপযোগী রাখা। আজ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির লক্ষ্যগত সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই। নতুবা আমাদের শিক্ষার অবাস্তবতা অব্যাপ্তি দূর হবে না।

শিক্ষাগত অব্যাপ্তির প্রতিকার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। শিক্ষার অবাস্তবতা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই অবাস্তবতারও দুই রূপ। একরূপ তার বিষয়গত, আর এক রূপ তার প্রণালীগত। বিষয়গত অবাস্তবতার কথাই প্রথমে উত্থাপন করা যাক।

বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথমেই চোখে পড়ে সাহিত্যের অতি প্রাধান্য, তা-ও আবার ইংরেজি সাহিত্যের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয়গুলির মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের অতি-প্রভুত্ব এখনও অত্যন্ত অনাবশ্যকভাবে উদ্ধত হয়ে রয়েছে। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি বহু বিষয়ের মধ্যে যে কোনো দুটি বিষয় তুমি তোমার শিক্ষণীয় বিষয় বলে বেছে নিতে পার, এ বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য (কেবল ভাষা নয়) তোমাকে পড়তেই হবে ; ওটা অবশ্যশিক্ষণীয়, কেননা ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞান না থাকলে অর্থাৎ সেক্সপীয়রের দু'খানি নাটক, শেলি-কীট-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

প্রমুখ কবিদের কতকগুলি কবিতা আর দু'-একখানি ইংরেজি উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই না পড়লে তুমি শিক্ষিত (অর্থাৎ বি-এ) বলে গণ্য হতে পার না। শিক্ষিত বলে গণ্য হবার পক্ষে ইংরেজি সাহিত্য-জ্ঞানের প্রয়োজন যে সর্বাধিক, তার আর এক প্রমাণ এই যে, শিক্ষিত-মর্যাদাপ্রার্থীদের অধিকাংশেরই অপঘাত ঘটে ওই ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষাতেই। আজকাল আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রাংশুলভ্য মর্যাদার প্রতি ক্ষুদে বাংলা ভাষা প্রায় সকলের অলক্ষ্যেই লোভে উদ্‌বাহু হয়ে উঠেছে; এটা যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ বামনের এই উদ্‌বাহু প্রচেষ্টার উপহাস্যতাটুকু উপভোগ করবার মতো লোকের অভাব ঘটেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠানে। বি-এ পরীক্ষার্থীদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে বাংলাকে মেনে নেবার মূলে ছিল বাঙ্গালির পক্ষে বাংলা ভাষার অধিকার থাকার আবশ্যকতা স্বীকার। আজও বি-এ পরীক্ষায় যে একপত্র বাংলা থাকে, তার মধ্যে ভাষা ব্যবহারের অধিকারের কথাই প্রধান, ওই পত্রে তিন-পঞ্চমাংশই ভাষা প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট। এতকালে ওই পত্রের সবটাতেই ছিল ভাষার অধিকার; কিন্তু কালক্রমে দুই-পঞ্চমাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে সাহিত্যের দাবী মেটাতে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের অধিকৃত ওই দুই-পঞ্চমাংশই এখন সবটার উপরে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। স্বল্প-পরিসর সাহিত্যের মহিমাই এখন ভাষার বৃহৎ পরিসরকেও অবজ্ঞেয় করে তুলেছে। সারা বৎসর ধরে কলেজগুলিতে শুধু ওই সাহিত্য অংশেরই পঠন-পাঠন হয়; আর ভাষা অংশটুকুর

সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক ঘটে শুধু পরীক্ষাগৃহে। ভাষা যাদের অচর্চিত তাদের হাতে সাহিত্য বিচারের কি পরিণতি ঘটে, সে সংবাদ রাখেন শুধু পরীক্ষকরা। যা হোক, একপত্র মাত্র বাংলার এই যে দুই-পঞ্চমা শ সাহিত্য, তার গৌরব কত। ওইটুকু পরিসরের মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেরই সমাবেশ ঘটে। প্রমীলার শৌর্য, কপালকুণ্ডলার অভিনবত্ব, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, শরৎচন্দ্রের সমাজদৃষ্টি এই সমস্তেরই বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় ওইটুকু পরিসরের মধ্যেই। এ সব থাকা চাই, কেননা সাহিত্যজ্ঞান না হলে যে শিক্ষামর্যাদারই অধিকার হয় না। 'আই-এ'র অবস্থাও তাই। তিনপত্রব্যাপী সাহিত্য-প্রধান ইংরেজি অবশ্যশিক্ষণীয় এবং একপত্রের দুই-পঞ্চমাংশের অধিকারী বাংলা সাহিত্যের অতি-প্রাধান্য। ম্যাট্রিকুলেশনও কৌলীন্যের লোভে ওই পথেই পরীক্ষা-তীর্থের দিকে যাত্রা করেছে। এখানে ইংরেজিতে আড়াই পত্র এবং বাংলার দুই পত্রে সাহিত্যের আধিপত্য। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আধিপত্য আই-এ, বি-এ-কেও ছাড়িয়ে গেছে। আর বাংলা পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বাংলার মহিমা উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে।

ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি-এ পর্যন্ত তিন পরীক্ষাতেই ইংরেজি সাহিত্যের অতি-প্রাধান্যের ফলাফল একটু বিচার করা যাক। একে তো বহু ছাত্রই স্বভাবতঃই ভাষা শিক্ষায়, বিশেষতঃ বিদেশী ভাষা শিক্ষায় অপটু, তার উপরে দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই

সহজাত সাহিত্যরসবোধের অধিকারী নয়। এই অবস্থায় সহজাত প্রবৃত্তি-নির্বিশেষে সকলকেই যদি সাহিত্য শিক্ষায় (এবং তাও বিদেশী ভাষায়) বাধ্য করা হয়, তাহলে ফল যা হতে পারে, তাই হচ্ছে। শনি এবং কলি একসঙ্গে উভয়েরই দৃষ্টি এসে পড়েছে আমাদের ছাত্রসমাজ তথা দেশের ভাগ্যের উপরে। একে ইংরেজি তায় সাহিত্য, এই দুয়ে মিলে যে কাণ্ডটা ঘটিয়ে তুলেছে, তাতে এসে আবার যোগ দিয়েছে অবশ্যশিক্ষণীয় বাংলা সাহিত্যের অংশটুকু। এইভাবে আমাদের সমস্ত ছাত্র-সমাজকে অর্থাৎ সমস্ত জাতিটাকেই সাহিত্যের লোহার ছাঁচে ফেলে একাকৃতি করে গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে প্রায় এক শো' বছর ধরে। তাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যান্য অঙ্গ একেবারেই অপরিণত রয়েছে। তার উপরেও দুঃখের কথা, এই অপুষ্টি বিষয়ে আমাদের চেতনা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধার করে বলি—

"চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না।"

সাহিত্যপ্রধান শিক্ষায় আমাদের কল্পনাবৃত্তির অত্যধিক চর্চা হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিটা চর্চার অভাবে তুলনায় একান্তই অপরিণত হয়ে যায়।

আবার রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধার করি—

আমরা যতই বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই

গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।······আমাদের মতামত, কথাবার্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

—শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা

রসপ্রধান সাহিত্যের প্রাধান্য আমার জাতীয় চিত্ত-বৃত্তির দুর্বলতাকে কিভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্টতর উক্তিও আছে। রবীন্দ্রনাথ রসপ্রধান সাহিত্যের প্রতি বিমুখ ছিলেন, আশা করি একথা কেউ বলবেন না। সুতরাং সাহিত্যপ্রধান একাঙ্গীণ শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। তিনি বলেন :

"গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ আবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

—ভূমিকা, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ২

অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত মনের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, বি-এ, এম-এ পাশকরা মনের সম্পর্কে তা অপ্রযোজ্য নয়। এর প্রতিকারের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অচিরাৎ

প্রবর্তনের কথা বলেছেন তাতে সাহিত্য চর্চাকে ঐকান্তিক প্রাধান্য না দিয়ে বিজ্ঞান চর্চারও যথাযোগ্য স্থান থাকা চাই; নতুবা আমাদের বুদ্ধি নির্মল ও সতর্ক হবার অবকাশ পাবে না। বিজ্ঞান চর্চা বলতে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র রসায়নাদি জড়বিজ্ঞানের কথাই বোঝাচ্ছেন না; ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানও তাঁর অভিপ্রেত। প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' নামক যে বইখানির ভূমিকায় তিনি ওই অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেখানি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

বিজ্ঞানচর্চাহীন ইংরেজী-সাহিত্যপ্রধান এই যে আমাদের শিক্ষা, "তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না।" শিক্ষার এই ত্রুটি আমাদের সাহিত্যকেও আক্রমণ করেছে। সর্বাঙ্গপুষ্ট জাতীয় মনেরই সৃষ্টি সাহিত্য। সে মন যদি দুর্বল হয়, তার চিন্তা শক্তি যদি ক্ষীণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত হয়, তবে সে দুর্বলতা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি যদি বলিষ্ঠ না হয় তাহলে সাহিত্য-রসবোধও পূর্ণবিকশিত হতে পারে না। কারণ মানুষের রসবোধ ও কল্পনাবৃত্তি একান্তভাবে বুদ্ধি বা চিন্তা-নিরপেক্ষ নয়। আমাদের মননশক্তির দুর্বলতার ফলে আমাদের সাহিত্যেও যে জীবনীশক্তির অভাব ঘটছে, এ বিষয়ে বোধ করি রবীন্দ্রনাথই সব চেয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ দেওয়া যাক—

আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না

এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই।···আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যে সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না।

—শিক্ষার বাহন, শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই, সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে।"

অর্থাৎ আমাদেব শিক্ষাটাই ক্রটিময়। যে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাতেই গলদ, সে দেশের সাহিত্যও যে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের একাঙ্গীণতা তার অপুষ্টি ও দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথকে কতখানি পীড়া দিত, তার প্রমাণ পাই তাঁর এই উক্তিগুলিতে—

এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্‌ঘাটন করছে বিশ্ব রহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়।···তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে, যেদিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল। গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন।···আমাদের সাহিত্যে

রসেরই প্রাধান্য। সেই জন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোঁড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের সেই অবস্থা।”

—শিক্ষার বিকিরণ

বাংলা সাহিত্যে এই যে মনন চর্চার একান্ত অভাব ও রস-চর্চার অতি প্রাধান্য, তাতে আমাদের সাহিত্যেরও স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে সংযমের রাশ ঢিলে হয়ে গেছে এবং ফলে আমাদের দুর্বল কল্পনা শক্তি অতি সহজেই নানা রকম বিকৃতি ও রুগ্ন বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। বস্তুতঃ জাতীয় চিত্ত যদি জ্ঞানসমৃদ্ধ না হয়, তা হলে তার সাহিত্যও কখনও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা পেতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের এই যে অপরিপুষ্টি ও রুগ্ন বিলাসপ্রবণতা, তার জন্যে দায়ী কে? তার প্রতিকারের উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“এ জন্য অন্ততঃ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়।”

শেষ পর্যন্ত এর প্রতিকারের যে পন্থা তিনি নির্ণয় করেছেন, তা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষাকে দেশের উপযোগী ও সর্বাঙ্গীণ করে তোলবার জন্যে।

বর্তমানে স্বাধীন ভারতে শিক্ষাসংস্কারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্যিক রসচর্চার অতি প্রাধান্য হ্রাস করে মননসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে আনুপাতিক গুরুত্ব দান করা। জীবন সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষাপ্রার্থী প্রত্যেক ছাত্রকে শেক্‌স্পীয়রের নাটক প্রভৃতি রস-প্রধান সাহিত্য আয়ত্ত করতে বাধ্য করা যে কত বড় অত্যাচার এবং তাতে জাতীয় শক্তির যে কতখানি অপচয় ঘটে, দীর্ঘ-কালীন অন্ধ অভ্যাসের ফলে তা অনুমান করবার শক্তি পর্যন্ত আমরা হারিয়েছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে, যাদের সহজাত সাহিত্য-প্রবণতা নেই, তাদের জীবন যে কিভাবে নিস্ফল হতে বাধ্য হয় তার হিসাব রাখে কে? তার উপরে যারা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে স্বভাবতঃই অনিপুণ তারা বিনা দোষে জীবনব্যাপী ব্যর্থতার শাস্তি পেতে থাকে। তাতে যে সমস্ত জাতিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে কথাটা ভেবে দেখবার সময় কি এখনও এল না?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছাত্রদের এর অবশ্যশিক্ষণীয়তার দুশ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাতে যে শুধু ছাত্রদেরই কল্যাণ তা নয়, তাতে সাহিত্যচর্চার পথও প্রশস্ততর হবে। যেখানে নিপুণ, অনিপুণ ও মাঝারি সবরকম ছাত্রেরই একত্র

সমাবেশ এবং যেখানে সকলের পক্ষেই সাহিত্য পরীক্ষায় পাস-মার্কা পাওয়া অত্যাবশ্যক, সেখানে স্বভাবতঃই সাহিত্য-চর্চার মানকে নামিয়ে আনতে হয়। তাতে আলোচিত সাহিত্যের প্রতিও যথোচিত সুবিচার করা হয় না এবং সাহিত্যনিপুণ ছাত্রদের মেধাও পূর্ণবিকাশের অবকাশ পায় না।

অতএব আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যকে অবশ্য স্বীকার্য বিষয় বলে গণ্য না করে ঐচ্ছিক বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করা চাই। এটাই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অবশ্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ছাত্রদের অধিকার পরীক্ষার জন্যে এক এক পত্র থাকা প্রয়োজন। ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আরও কিছুদিন দেশে প্রবল থাকবে, একথা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

আমাদের শিক্ষার বিষয়গত ত্রুটির মধ্যে একটি হচ্ছে সাহিত্যের বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের অতিপ্রাধান্য। আর একটি হচ্ছে মনন-সাপেক্ষ বিষয়গুলির অবাস্তবতা ও অসার্থকতা। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যেসব বিষয় সর্বজনীন, যেসব বিষয়ের দেশ-কালসাপেক্ষতা নেই, সেসব বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগের খুব বেশি কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি যেসব সমাজবিদ্যা দেশ কাল ও জাতির সম্পর্কে বিশেষ রূপ ধারণ করে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হবার সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে জড়বিদ্যাই হোক আর সমাজবিদ্যাই হোক, বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই

তার একমাত্র সার্থকতা নয়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন সমস্যার সমাধানে সেসব বিদ্যার প্রযোজ্যতাও কম কাম্য নয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় আমরা যেসব বিদ্যা অর্জন করি, আমাদের জীবন-নিয়ন্ত্রণের কাজে সেগুলি কতখানি সহায়তা করে ? আমাদের জীবন ও শিক্ষার মধ্যে যে কতখানি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিরাজ করছে, সে বিষয়ে সচেতনতার লেশমাত্রও কোথাও দেখি না। অথচ এই ব্যবধান ঘোচাবার অত্যাবশ্যকতার প্রতি শিক্ষানায়কদের দৃষ্টি সবলে আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ সালেই তাঁর তৎকালীন অভিমত আজও উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

"আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে ; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই ; যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না।······আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই।···আমাদের জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে। এইজন্য দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চির-কুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন ; এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শতসহস্র লুতাতন্তু-

পাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন।...তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনও সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।......যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে।...এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির জীবনযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়!......

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

— শিক্ষার হেরফের, শিক্ষা

যে প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশিত হয়, সেটি তৎকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ মোহন বসুর ন্যায় মনীষীদেরও আন্তরিক অনুমোদন লাভ করে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং

একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।”

—রচনাবলী ১২, পৃ ১৬

বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বীদের প্রয়াস সত্ত্বেও তৎকালে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের অসামঞ্জস্য ঘোচাবার কথায় কেউ কান দেননি। কেননা সেনেট সভার সব সদস্যই ছিলেন বিশেষ সম্ভ্রান্ত, শিক্ষা-বিষয়ে ভ্রান্তি ছাড়া তাঁদের কাছে কিছুই আশা করা চলত না। সে ভ্রান্তি কি আজও ঘুচেছে? নতুবা ১৯৩৩ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন থেকে রবীন্দ্রনাথকে অতি বেদনার সঙ্গেই একথা বলতে হল কেন?—

আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বই-এর শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না।

—শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষা

যে শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রতিবাদ করেন ১৮৯২ সালে, যা নিয়ে ১৯৩৩ সালেও তাঁকে দুঃখ করতে হয়েছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বৎসর পরে আজও তাব প্রতিকারের যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা ও জীবন, বিদ্যা ও দেশের মধ্যে এ যে বিচ্ছেদ বা বিরুদ্ধতা, তার অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবনও সার্থকতার সন্ধান পাবে না, দেশেরও কল্যাণ হবে না। যে জ্ঞান জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চার করে না, তারই পোষণ ও বিস্তারের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন দেশের অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয়মাত্র। আমাদেব শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের ধারা এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের ধারা যে দুটি পৃথক খাতে বয়ে চলেছে, দেশের মধ্যে বিদ্যা ও জীবনের মিলনতীর্থ গড়ে তুলছে না। তা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ বলেই বোধ করি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না। কাজেই বাধ্য হয়ে এই নিত্য-প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। আমাদের ইস্কুলের পাঠক্রমে বেচুআনাল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার ব্যবস্থা আছে, আমাদের প্রত্যেকের দেহস্থিত প্যানক্রিয়েটিক গ্লাণ্ড সম্বন্ধে কোনো কথাই জানবার দরকার হয় না; গালফ স্ট্রীম কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় যায় এবং তার ফলাফল জানা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হয় কিন্তু আমাদের দেহের রক্তধারা কিভাবে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে জীবনক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে তা জানা আবশ্যিক বলে স্বীকৃতী নয়। ভূগোল বিদ্যার প্রয়োজন নেই একথা কেউ বলবে না, কিন্তু প্রাথমিক দেহবিদ্যার প্রয়োজন

যে তার চেয়ে কম নয় একথাও স্বীকার করা চাই। ভূগোলের মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হয় না; প্রাথমিক দেহবিদ্যার অভাবে ঠিকমতো অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের মত জীবন ধারণই যে অসম্ভব হয়। আমাদের কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী ও দেশব্যাপা অজস্র রোগের প্রকোপের কথা ভাবলে মনে হয় যে, শুধু প্রাণী হিসাবে আমাদের মাত্র বেঁচে থাকার মূলেও অশিক্ষা অহরহ কি মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেরও প্রাত্যহিক দেহযাত্রানির্বাহের মধ্যে কত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা উপলব্ধি করবার মতো শিক্ষাও এদেশে নেই। দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য ও মহামারী নিবারণের জন্য গবেষণাগার ও ভেষজপত্র নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কোনো ফল হবে না, যদি বিদ্যালয়ের নিম্নতম স্তর থেকে শিক্ষার যোগে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না হয়। কেন-না, যে দুর্বলতার সুযোগে রোগ আমাদের প্রাণ-মুলে আক্রমণ চালাচ্ছে সে দুর্বলতা ততটা দেহগত নয় যতটা মনোগত; সে দুর্বলতা আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের অশিক্ষা। পশ্চিমের কাছ থেকে আমাদের আর কিছু শিক্ষণীয় না থাকলেও একটি তত্ত্ব শিখতেই হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। সে তত্ত্বটি এই—Knowledge is power, জ্ঞানই শক্তি। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে একটি দৃষ্টান্ত দেই।—

"যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটি বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে

বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে চোখ বুজে ঠিক করে বসে থাকে, সে দেশে মা শীতলা থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না।”

—সমাধান, কালান্তর

বস্তুত দেশ থেকে অস্বাস্থ্য ও রোগের প্রকোপ দূর করবার সংগ্রামে দুর্গ স্থাপন করতে হবে বিদ্যাগৃহে, ডাক্তারখানায় নয়; সে সংগ্রামের অগ্রগামী সেনা হবেন শিক্ষকরা, চিকিৎসক থাকবেন তাঁদের পিছনে।

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ আমাদের পক্ষে কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠেছে তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। শুধু দেহগত জীবন নয়, এই বিচ্ছেদ আমাদের মনোজীবনকেও জীর্ণ করছে; আমাদের সমাজ এবং সংস্কৃতিও পঙ্গুতায় আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের বি-এ এম-এ পাশ-করা একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনের কথাই ধরা যাক। দেখব সে মনের কাছে বিদেশ অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য জগতই জ্ঞানের আলোকে অল্পাধিক উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; এশিয়া কিংবা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা দেশ, একেবারেই অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে মনের কাছে ইংরেজি সাহিত্য, এমনকি ফরাসি বা জার্মান সাহিত্যের কথা সুপরিচিত, কিন্তু গুজরাটি, মারাঠি বা তামিল সাহিত্য একেবারেই অপরিচিত। সে মনের কাছে সিংহল কেরল বা উৎকল ইউরোপের ইতালি স্পেন বা আয়ারল্যাণ্ডের চেয়েও দূরবর্তী। ইতালীয় রেনেসাঁস বা জার্মান

রিফরমেশানের ভাবধারা অনেকাংশেই আমাদের মনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, কিন্তু রামানন্দ কবীর নানক প্রভৃতির ধর্ম আন্দোলন বা তৎকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমাদের মনে প্রবেশাধিকার পায় না। গ্রীস-রোমের ইতিহাস অনেকটাই আমাদের অধিগত, কিন্তু ইরাণ-আরব বা চীন-জাপানের কোন ইতিহাস আছে বলেই আমাদের বোধ নেই। আলফ্রেড দি গ্রেট্ বা শার্লেমাঁকে আমরা আত্মীয় বলেই বোধ করি, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন বা হোসেন শাহ আমাদের একান্তই পর। আমাদের কাছে হানিবাল বা জুলিঅস সীজরের বীরত্ব খুবই বিস্ময়কর, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বা পুষ্যমিত্রের মর্যাদা ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে—ইউরোপকে আমরা যতটা জানি, এশিয়াকে তার সিকিভাগও জানি না; ভারতবর্ষকে মোটামুটিভাবে যদিও বা কিছুটা জানি, বাংলা দেশ সম্বন্ধে তাও বলা যায় না। ইতিহাসে এম এ পাশ করা শিক্ষিত (?) মনের কাছেও বাংলা দেশের ইতিহাস একেবারেই অন্ধকারময়। কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠক্রমের মধ্যে বাংলা দেশের স্থান কোথাও নেই। বস্তুত আমরা যতই ঘরের কাছে আসি ততই আমাদের অজ্ঞতা গাঢ়তর হয়। আমাদের বিপরীতগামী শিক্ষা 'দূরকে করিল নিকট বন্ধু, পরকে করিল ভাই'; সে শিক্ষায় তাই বন্ধুকে করা হয় দূর এবং ভাইকে করা হয় পর। তার ফলেই হয় আত্মগ্লানি ও আত্ম-বিচ্ছেদ।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

বৈষ্ণব পদকর্তার এই বাণী আমাদের আধুনিক শিক্ষায় এমন মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে যে, এর প্রতিকার না হলে আমাদের আর নিষ্কৃতি নেই। দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করতে দোষ নেই, বরং সেটাই যথার্থ শিক্ষার একটা মূল লক্ষ্য। কিন্তু ঘরকে বাহির ও আপনকে পব করার মারাত্মক শিক্ষার অচিরাৎ অবসান চাই, নতুবা সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় নিকট ও দূর, আপন ও পর উভয়ের যথাযোগ্য স্থান অবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু শিক্ষার স্বাভাবিক গতি নিকট থেকে দূরের দিকে, আপন থেকে পরের দিকে। এই গতি যদি বিপরীতমুখী হয় তবে যে শিক্ষা লাভ হয়, তার বিষক্রিয়ার ফলেই তো আজ সমস্ত দেশ জর্জরিত। কিভাবে আমাদের শিক্ষার স্বাভাবিক গতি পুনঃপ্রবর্তিত করা যায়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তযোগে অতি স্পষ্টভাষায় আমাদের কাছে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করেছেন। সে কথা আজ শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করবার সময় এসেছে।—

জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে।

আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে-ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না।······আমরা নৃতত্ত্ব বা ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত, পোদ-বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না।

বা লা দেশ আমাদের নিকটতম। ইহার ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ্য রাখে, তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পাবে।······

এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের এমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে এমন বোধহয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর-দেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনও হইতেই পারে না।”

—স্বাধীন শিক্ষা, পাঠ প্রচয়, চতুর্থ ভাগ

শিক্ষার গতি কোন্ দিকে এবং শিক্ষণীয় বিষয় কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সুস্পষ্ট। প্রথমে বাংলা দেশ, তার পরে ভারতবর্ষ এবং আবও পবে দূর দেশের দিকে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকবে এই ছিল তাঁব অভিপ্রায়। এই শিক্ষাক্রমের এই উদ্দেশ্য ছাত্রদের জ্ঞানবৃত্তিকে শক্তি-সঞ্চয়েব স্বাভাবিক পথে চালনা করা, আব-এক উদ্দেশ্য শিক্ষার সঙ্গে দেশের যোগ স্থাপন করা। তাতে ব্যক্তি ও দেশ উভয়েরই কল্যাণ। ছাত্রদের কি কল্যাণ, সে সম্পর্কে উক্ত 'স্বাধীন শিক্ষা' প্রবন্ধেই ববীন্দ্রনাথ দৃঢ় ভাষায় বলেছেন —

"একথা সদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য বক্ষা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।"

আমাদের শিক্ষাকে নিষ্ফলতা থেকে রক্ষা করবাব কোনো চেষ্টাই হ'ল না, রবীন্দ্রনাথের এ ক্ষোভ তাঁর মৃত্যুকালেও ঘোচেনি। তাঁকে দেখে যেতে হয়েছে আমাদের ছাত্রদের উপরে গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড এমন কি পৃথিবীর ইতিহাস অধিগত করবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, অথচ আমাদের নিকটতম বাংলা দেশকেই একেবারে উচ্চতম শিক্ষা পরিধিরও বাইরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে কি ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটে? না, দেশের সঙ্গে বিদ্যার মিলন ঘটে? রবীন্দ্রনাথ ববাবরই বলেছেন, "কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে

দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে” (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, শিক্ষা)। সে দেশ যে মুখ্যত বাংলা দেশ এবং শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিক যোগের অভাবে দেশেরও হীনতা ঘটেছে, সে কথাও তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।—

“বাংলা দেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোক-বিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বিশেষভাবে আমাদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।······সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।”

—স্বাধীন শিক্ষা

আমাদের জ্ঞানের কাছে আমাদের স্বদেশের এই ক্ষুদ্রতা ও দীনতা ঘোচাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, একথা আমাদের

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালে ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি পরে ‘শিক্ষা’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয। তারপরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে এটি ‘সঙ্কলন’ গ্রন্থে স্থান পায়। আরও পরে এটি আবার নূতন রূপে ও ‘স্বাধীন শিক্ষা’ নামে ‘পাঠ প্রচয় গ্রন্থে’ গৃহীত হয়। তবেই এটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয। এটির উপযোগিতা আজও সমভাবে বিদ্যমান।

শিক্ষা-নায়কদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি। স্বদেশ বলতে উধৃত অংশে মুখ্যত বাংলা দেশকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত একটি অংশ এবং অন্যান্য রচনা থেকে বোঝা যায় শুধু বাংলা দেশ নয়, ভারতবর্ষও রবীন্দ্রকল্পিত শিক্ষাবিধিতে স্বদেশপদবাচ্য। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হেমলতা দেবী প্রণীত শিশু পাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, ইস্কুলের পাঠক্রম নির্ণয় উপলক্ষ্যে শিক্ষা-নায়কের পক্ষে আজ তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ ও ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কি। এমন কি, আমরা বলি ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র "ভারতবর্ষ" নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার উইলিয়ম হণ্টারের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাঙ্গলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।"

—ভারতী, ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৮৬—৮৭

ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণসহ একখানি ভারত পরিচয় গ্রন্থ প্রথমে পড়তে দিয়ে পরে ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিশদভাবে পড়াবার সমীচীনতা সহজেই বোঝা যায়। বাংলা দেশ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। ভূগোল ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণসহ একখানি সরল স্বল্পায়তন অথচ সম্পূর্ণ পুস্তক প্রথমে শিখিয়ে নিয়ে পরে বাংলার ইতিহাস প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

চিত্তের উন্মেষ সাধনের দিক থেকেই হক, দেশের সঙ্গে যোগ স্থাপনের দিক্ থেকেই হক, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে স্বদেশের ইতিহাসের একটি বড় স্থান ছিল। কেন না ইতিহাসের মধ্যেই স্বদেশের প্রাণস্বরূপ বিশিষ্ট প্রতিভার এবং তার কালক্রমাগত বিকাশধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তাই তিনি বলেছেন—

"বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে।······এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাহার অধ্যাপনার প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৩৮৬—৮৭

স্বদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের কথাই বলতে চেয়েছেন যা স্বদেশের প্রাণসত্তা ও তার আবহ-মানকালীন ক্রমোন্মেষের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়। বাংলা দেশই বলো, ভারতবর্ষই বলো, আমাদের স্বদেশের তেমন সম্পূর্ণ ইতিহাসের অভাব তাঁর মনকে খুবই পীড়া দিত। তাই তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন—

"যে সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৩৭৯

রবীন্দ্রনাথের অভিমতের যদি কোনো মূল্য আজও থাকে, তবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাকে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যত সত্বর তেমন ইতিহাস পুস্তকের রচনা ও পঠন-পাঠন শুরু হয় ততই কল্যাণ।

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস নয়, স্বদেশের ভাষা সাহিত্য ভূগোল নৃতত্ত্ব সমাজবিন্যাস ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সাগ্রহ পরিচয় স্থাপনের উপরেই আমাদের স্বাধীন শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বদেশকে জ্ঞান ও হৃদয়ের দ্বারা ঘনিষ্ঠ উপলব্ধির আয়োজন করে তবে আমাদের বিদ্যাকে বিশ্বমানবের বৃহৎ ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত করতে হবে। যে শিক্ষার্থীর হৃদয়মনে নিত্য-প্রত্যক্ষ স্বদেশের উপলব্ধিই হয়নি, তার কাছে বিশ্বোপলব্ধির প্রত্যাশা করাও অন্যায়।

শিক্ষার মুক্তি

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের নাম 'স্বাধীন শিক্ষা'। এটি হচ্ছে মূলতঃ ১৯০৫ সালে স্বাদেশিক উদ্দীপনার যুগে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'। এই সম্ভাষণে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করেন বিদেশী চালিত কলেজী শিক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বিস্তীর্ণ-দেশের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে, শিক্ষাকে স্বাধীন চিন্তার উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে। কেন না তিনি জানতেন শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের অমোঘ অস্ত্র। শিক্ষা যখন প্রতিকূল শাসন-শক্তিব হাতে থাকে, তখন তাই হয় পীড়ন ও পরাধীনতার সহায়ক।

সুতরাং দেশকে প্রতিকূল সরকারে হাত থেকে মুক্ত করতে সর্বাগ্রে চাই স্বাধীন শিক্ষা। নিপীড়িত অসহায় জাতির পক্ষে পীড়ক ও শোষক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে বিদ্যালয়-গুলিই হয় দুর্গ এবং স্বাধীন শিক্ষাই হয় তার অস্ত্র। প্রতিকূল শাসনশক্তির হাতে এই বিদ্যালয়গুলিই হয়ে ওঠে 'গোলামখানা'। তাই স্বদেশ-পাঠকদের প্রধান ব্রত হল ওই গোলামখানাগুলিকে মুক্তিদুর্গে পরিণত করা কিংবা স্বাধীনভাবে মুক্তিদুর্গের প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতকে তারই অন্যতম প্রথম নির্দশন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় এবং স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাংলাদেশে এই স্বাধীন-শিক্ষা

সাধনার ইতিহাস দীর্ঘকালব্যাপী; ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই তার প্রথম সূচনা।

তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভারতবর্ষে নব্য শিক্ষার প্রেরণাই জয়ী হয়েছে; আমাদের অধীনতা-নিরসনের মূলে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর স্বদেশ সাধনা। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রসুন্দর, বিনয় সরকার, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি নাম স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বাংলার বাইরেও মদনমোহন, গোখলে, শ্রীনিবাস প্রমুখ বহু মনস্বীর নাম স্মরণীয়। বস্তুতঃ ভারতীয় মুক্তির মূলে রয়েছে স্বদেশীব্রতীর শিক্ষাসাধনা ও শিক্ষাব্রতীর স্বদেশ সাধনা।

বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংগ্রাম চলেছে শতাধিক বৎসর। এই মুক্তিসংগ্রামের সূত্রপাত হয় পলাশির যুদ্ধের ষাটবৎসর পর ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এই সময় থেকে শিক্ষাকে আশ্রয় করে দেশের চিত্তমুক্তির যে সূচনা হল, তার সাধনা চলল দীর্ঘকাল ধরে। এই অতিদীর্ঘতার অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক রাজশক্তি তথা ধর্মযাজক শক্তির প্রতিকূলতা। বৈদেশিক শক্তির একথা ভালোই জানা ছিল যে, দেশের অশিক্ষা তথা বিকৃত শিক্ষার উপরেই তার প্রভুত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে; প্রকৃত শিক্ষা ও জন জাগরণের সমক্ষে টিকে থাকবার সাধ্য তার নেই। তাই পলাশির যুদ্ধের পরে প্রায় আশি বৎসর ইংরেজ

সরকার এদেশের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অতঃপর তারা যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল, তখন তারা নিত্য সযত্ন থাকল যাতে জনসাধারণের মধ্যে সত্যশিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে না পড়ে এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা যাতে দেশের চিত্তকে সরকারের অনুকূল করে তোলে। অপর দিকে দেশের নায়কেবা যত্নপর হলেন মিশনারী প্রভাব ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দেশের শিক্ষাকে চিত্তমুক্তির উপযোগী করে তুলতে ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার দান করতে। দুই বিরোধী পক্ষের এই টানাটানির ফলেই আমাদের শিক্ষাস'গ্রাম এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে এব' ইংরেজ রাজত্বেব অবসানকালেও আমাদের শিক্ষা আমাদের চিত্তে সত্যরূপে ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি।

বৈদেশিক রাজশক্তির শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ছিল দুই দিকে। প্রথমতঃ শিক্ষাকে স্বদেশবিমুখ তথা অবাস্তব করে বাখা, যাতে শিক্ষার ফলে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের আত্মস্বরূপ ও আত্মশক্তির উপলব্ধি না ঘটতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাকে ইংরেজি ভাষায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা, যাতে বিদেশী ভাষার মধ্যস্থতার ফলে দেশের চিত্তকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করতে না পারে ও স্ব-ভাষার বাহকতার ফলে অবাধ ব্যাপকতা লাভ করতে না পারে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের এই দুটি লক্ষ্য বা কুফলকে ব্যর্থ করে শিক্ষাকে যাতে ব্যাপকভাবে দেশের আত্মোপলব্ধির কাজে লাগানো যায়, সে চেষ্টায় ব্রতী হলেন দেশের শিক্ষানায়কেরা।

এই শিক্ষাসংগ্রামের প্রথম মহানায়ক হলেন রামমোহন

রায়। ১৮১৭ সালে হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিশ্ববিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত হল। কিন্তু সে শিক্ষার বাহন ইংরেজি এবং তার বিষয়বস্তু অভারতীয়। ফলে সে শিক্ষার ব্যাপক হবার কিংবা আত্মোপলব্ধির সহায়ক হবাব সম্ভাবনা ছিল না। তাই রামমোহন রায় ১৮২২ সালে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইংরেজি-বাংলা দুই-ই বিশেষ যত্ন-সহকারে শেখানো হত। বোধ করি বাংলা ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহচর্যদানের এই প্রথম প্রয়াস। শুধু স্বভাষা নয়, স্বদেশ এবং স্বধর্মের সংস্কার ও উন্নতিসাধন ছিল রামমোহন রায়ের এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন (১৮২৭—৩০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জীবনে এই স্কুলের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। ১৮৩২ সালে এ্যাংলো-হিন্দু-স্কুলের ছাত্ররা "সর্বতত্ত্ব-দীপিকা" নামে একটি সভা স্থাপন করে এবং দেবেন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। এই সভার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার চর্চা এবং বাংলা ভাষাতেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা। এমন কি, বাংলা ভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোনো কথোপ-কথনও হতে পারত না। এর থেকেই রামমোহনের শিক্ষার স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। ১৮৩৮ সালে রামমোহনের অনুবর্তী তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ তৎকালীন নব্যশিক্ষিতরা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা

সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ এ সভারও সভ্য ছিলেন। এ সভাতে ইংরেজি-বাংলা দুই ভাষাতেই বিবিধ জ্ঞানের আলোচনা হত। এই সভার সদস্যদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের কতখানি উন্নতি সাধিত হয়েছে তা আজ আব অবিদিত নাই। পরের বৎসব দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বোধিনী সভা' নামে আর একটি সভা স্থাপন কবেন। এর উদ্দেশ্য ছিল উদাবতব ও গভীরতর, - জাতীয় ভাষাব যোগে জাতীয় সংস্কৃতিব উৎকষ সাধন। এই সভার উদ্যোগে ১৮৪৩ সালে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হল সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমাব দত্তেব উপরে। এই পত্রিকাব যোগে বাংলার জ্ঞান ও চিন্তা দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল মাতৃভাষায়। তাতে যে সব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল, তার মধ্যে বাজশক্তি নিরপেক্ষ স্বাধীন শিক্ষা অন্যতম। এই স্বাধীন শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪০ সালেই তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৫ সালে ইংবেজ সবকার স্থিব কবেন একমাত্র ইংরেজি শিক্ষিতরাই বাজকার্যেব যোগ্য বলে গণ্য হবে। জাতীয় সংস্কৃতিব এই সংকটকালেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ও তত্ত্বোধিনী সভা এবং হিন্দু কলেজের আদর্শ বাংলা পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদক অক্ষয়কুমার হলেন পাঠশালার অন্যতম মুখ্য শিক্ষক। মাতৃ-ভাষার যোগে স্বাধীনভাবে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই দুই পাঠশালার উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্র নাথ সরকারি প্রভাবমুক্ত

হয়ে স্বাধীনভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্বও স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতা থেকে হুগলি জেলার বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই পাঠশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারেব নিম্নলিখিত উক্তি বাংলাব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।—

আমবা পরের শাসনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি।...অতএব এইক্ষণে আমাদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষাপ্রদান কবা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান কবা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।...বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা...এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।...

—সাহিত্য সাধক-চরিতমালা, ৪৫, পৃ ৩৬-৩৮

এর পরের বৎসর পাঠশালার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় পাঠশালাতে পদাথবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিতরিত হইতে পারিবেক।

—ঐ, পৃ ৩৯

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা আট বৎসর চলেছিল। ১৮৪৮ সালে এটি নানা কারণে উঠে যায়। এ

প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল এবং দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরবর্তী কালের রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের (১৯০১) অগ্রদূত। তিন বিদ্যালয়েরই উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

১৮৪৬ সালে কলিকাতায় হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম। এই বিদ্যালয়েও বাংলা শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অন্যতম মুখ্য অধ্যাপক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত আর হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া ত্রিপুরা জেলায় স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত বরকামতা গ্রামেও দেবেন্দ্রনাথ একটি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হত।

দেশে বাংলা শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। অবশেষে ১৮৫৫ সালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করতে প্রবর্তিত করেন। সরকারও তাঁর উপরেই বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব দেন। তখন তিনি এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন (১৮৫৫)। প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ও পাঠশালার অন্যতম মুখ্য শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ

অক্ষয়কুমার দত্ত। বলা বাহুল্য, এই সব বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে সরকারী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। এই বাংলা শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব স্বভাবতই অনুকূল ছিল। তারই ফলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে এই নর্ম্যাল স্কুলে ভরতি করানো হয়েছিল, আর এই নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষাই তাঁর সাহিত্য-জীবনের তথা তাঁর শিক্ষা-নীতির ভিত্তি রচনা করেছিল। এই কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে সানন্দে প্রকাশ করেছেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে এই নর্ম্যাল স্কুলের আদর্শও কিছু পরিমাণে কাজ করেছিল সন্দেহ নাই। বাংলা দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নর্ম্যাল স্কুলের কথাও অবশ্য স্মরণীয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজি, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত ইত্যাদির ন্যায় বাংলা সাহিত্যও অবশ্য পাঠ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যেরও পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যার মন্দিরে বাংলা সাহিত্য-সরস্বতীর এই মর্যাদা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। ১৮৬৮ সালে তাঁকে ওই বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিতে হয়! বাংলাদেশের বিদ্যায়তন থেকে বাংলার এই নির্বাসন তখন দেশের চিত্তে কোনো আলোড়ন জাগিয়েছিল কিনা জানি

না। তখন থেকেই বাংলার বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংরেজির একাধিপত্য। অবশেষে বাংলার শিক্ষামুক্তিব্রত আশুতোষের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ১৯০৬ সাল থেকে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতৃমন্দিরে মাতৃভাষার স্থান একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আজও বিমাতৃগৌরবের পার্শ্ববর্তী দীনা মাতৃভাষার মলিন রূপ বঙ্গ-সন্তানের হৃদয়ে বেদনা সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আমাদের শিল্পব্যবস্থায় ইংরেজির এই একাধিপত্যই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইংরেজের প্রভাব গিয়েছে, কিন্তু ইংরেজির প্রভাব যায়নি। শিশুকাল থেকে ইংরেজি শিক্ষার লৌহ-বেষ্টনে আমাদের মন হয়ে যায় পঙ্গু, অচল। ফলে আমাদের সাহিত্য তথা জাতীয় জীবনও পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। আজ এই বিংশ শতকের মধ্যভাগেও যে দেশ অশিক্ষা তথা দারিদ্র্য-দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, তার মূলে আছে শিক্ষায় ইংরেজির সর্বগ্রাসী একাধিপত্য। আধুনিক কালের সর্বাঙ্গীণ মহৎ শিক্ষার আদর্শ আমাদের চারদিকেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। অথচ আমরা তার সুফল থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত আছি। তার কারণ ইংরেজি ভাষার লৌহ-যবনিকা বা দুর্ভেদ্য ব্যবধান। ১৮৮৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না" (ভারতী ১২৯০, কার্তিক)। তারপর

বহু বৎসর পার হয়ে গেল, কিন্তু এই দুঃসহ অবস্থার কোনো প্রতিকারের লক্ষণ আজও দেখা গেল না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন, লোকেন্দ্রনাথ, গুরুদাস, আশুতোষ প্রভৃতি বহু মনস্বীর সাধনা ও বাণী আজ পর্যন্তও নিষ্ফলই রয়ে গেল।

অনেকে মনে করেন ইস্কুলের শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষায় কিছুতেই দেওয়া চলে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ ও কঠোর মন্তব্যের কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষাও যে মাতৃভাষার যোগে দেওয়া সম্ভব, একথা কে সাহস করে প্রথম বলেন জানি না। ১৮৮০ সালে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'কলেজী শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে অভিমত প্রকাশ করেন তাতে গভীর চিন্তা ও প্রবল সাহসের পরিচয় পাই। সে অভিমতের কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি নিঃসংশয় সাহসের সহিতই বলেছেন, কলেজের শিক্ষাও বাংলাতেই দেওয়া উচিত। এর পরে আশী বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু এই অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিকারের কোনো আশা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের শিক্ষা-সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক আশুতোষ। দেশের শিক্ষামুক্তির জন্য তাঁকে প্রভুশক্তির সঙ্গে কিরূপ কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, আশা করি তা এখনও বিস্মৃত হয়ে যাননি। কিন্তু পুরুষসিংহ আশুতোষের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেবার কোনো প্রয়াস দেখি না। তাঁর মর্মর

মূর্তির কণ্ঠে বৎসর বৎসর পুষ্পমাল্য অর্পণ করেই কি আমরা কর্তব্য সমাপ্ত করব? তাঁর জীবন-সাধনার মর্ম কি আমরা কখনও উপলব্ধি করব না?

আমাদের শিক্ষা-সংগ্রামের আর এক মহানায়ক রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ জীবন-সাধনার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি একটি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমূর্তি দেখে যাবার কামনা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অতৃপ্ত কামনা নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে। তখন পরাধীনতার বাধা ছিল। এখন আর তা নাই। কিন্তু সে কামনা পূরণের কোন আভাস দেশের দিগন্তে আজও দেখা দেয়নি। এমন কি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি পরিপূর্ণ বিমুখতা বা ঔদাসীন্যে দেখি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতেও। রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ করে বলেছিলেন, "অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে।...... তাদের দেশের যমস্ত কাজই হয় নিজের ভাষায়"। আর আমাদের সমস্ত কাজই হয় বিদেশের ভাষায়। তাঁর এই ক্ষোভ বিদূরণের ক্ষীণতম প্রয়াসও দেখি না কোথাও। আজকাল অবশ্য শিক্ষা সংস্কারের নানারকম প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে নানা দিক থেকে। কিন্তু মাতৃভাষার স্রোতধারাকে উচ্চতম শিক্ষার সাগরসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত করে নিতে পারেন, এমন কোনো ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তে।

একজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ মনীষীকে ক্ষুব্ধচিত্তে বলতে শুনেছি, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে জাতীয় বিপ্লব

ঘটেছে, যার ফলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হল, সে হচ্ছে revolution arrested half way। তিনি গভীর দুঃখের সহিত অনুভব করেছেন যে, too much toleration of English tradition and institutions-এর একটা মনোভাবই স্বাধীন ভারতে ওই বিপ্লবকে অর্ধপথেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। জাতীয় জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, শিক্ষাব ক্ষেত্রে ওই বিপ্লবের বেগ যে দ্বারপ্রান্তে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে যে শিক্ষা-বিপ্লবের আরম্ভ, ১৯০৫ সালে বাংলার জাগরণে যার শক্তিসঞ্চয় এবং আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের হাতে যার প্রসার, আজ স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে প্রবেশ করে সে বিপ্লব যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অথচ আজ আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবই চাই, সংস্কারমাত্র নয়। কেন না দাসত্বের ঐতিহ্যলাঞ্ছিত শিক্ষার সংকীর্ণ ও জীর্ণ ভিত্তির উপরে স্বাধীনতার ইমারত কখনও স্থায়ী হতে পারে না।

ভাষার মুক্তি

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিখ্যাত মুকুন্দ দাসের দৃপ্তকণ্ঠে গান শুনেছিলাম—

> ইংরেজ আর কি দেখাও ভয় ?
> দেহ তোমার অধীন বটে,
> মন তো স্বাধীন রয়।

আজ ইংরেজ গেছে, আমাদের দেহ স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু মন স্বাধীন হয়েছে কি ? পুরোপুরি হয়েছে বলতে পারি না। ইংরেজ আমাদের যেভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, আজও আমরা অনেক অংশে সেভাবেই ভাবছি। স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন আদবকায়দা আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সব কিছুতেই তার নিদর্শন মিলবে। সবচেয়ে বেশী মিলবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষাব্যবস্থায়। ইংরেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে কাঠামো গড়ে দিয়ে গেছে, সে কাঠামোই আজ বজায় আছে; ইংরেজের দেওয়া শিক্ষার ভঙ্গী ও ব্যবস্থায় আজও স্বাধীন ভারতের হাতের ছাপ পড়েনি। তাতেই বোঝা যায়, আমাদের মনের মুক্তি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মন গড়বার কারখানা হচ্ছে বিদ্যালয়, আর তার উপায় হচ্ছে ভাষার স্বাধীনতা। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আজও স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মন তৈরী করার উপযোগী করে পুনর্গঠিত হ'ল না; ইংরেজের গড়া শিক্ষা ও ভাষার সঙ্কীর্ণ খাতেই আজ

আমাদের জাতীয় মনের ধারা পূর্ববৎ বয়ে চলেছে, তাতে না আছে বেগ, না বিস্তার, না গভীরতা। এখনও সেই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলকলেজের জাতিভেদ বহাল রয়েছে, এই জাতিভেদ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদের চেয়ে কম মারাত্মক নয়, কিন্তু তা তুলে দেবার ক্ষীণতম আভাসও দেখতে পাচ্ছি না! তা ছাড়া ভারতবর্ষ এখনও বৃটিশ গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহের মত ঘুরছে; তাই এখনও আমরা দুনিয়াটাকে ইংরেজের দৃষ্টিতেই দেখছি। ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে জাতীয় দৃষ্টির প্রতীক; ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যোগেই দুনিয়াটা আজও আমাদের চোখে পড়ছে। ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি অন্য সাহিত্যের যোগে আমরা বিশ্বব্যাপার কখনও দেখিনি, আর নিজের ভাষা ও সাহিত্যের স্বাধীন দৃষ্টিতেও দেখতে শিখিনি। তাই বলতে হয়, দেহ স্বাধীন হলেও আমাদের মনের মুক্তি এখনও বাকী আছে। রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা স্বাধীন হয়েছি, অর্থব্যাপারেও স্বাধীনতার জন্যে সচেষ্ট হয়েছি; কিন্তু মনের ব্যাপারে স্বাধীনতার উদ্যম কবে সুরু হবে?

মনের মুক্তি মানে ভাষা ও সাহিত্যের মুক্তি। তার প্রধান অন্তরায় দুটি, ইংরেজি ও হিন্দি। কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। একদল বলছেন, ইংরেজকে সরালেও ইংরেজিকে তার স্থান থেকে সরানো চলবে না, সরালে দেশ মধ্যযুগের অন্ধকারে ডুবে যাবে। আর একদল বলছেন, হিন্দিকে ইংরেজির আসনে বসাতেই হবে, নইলে সদ্যপাওয়া স্বাধীনতাই মিথ্যা হয়ে যাবে। দুটোই বাড়াবাড়ি বলে মনে করি।

ইংরেজির বিরুদ্ধে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন করলে মধ্যযুগের অন্ধকার দেখা দেবেই। দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো আনবার ওই একটিমাত্র জানালাই খোলা আছে। ওই জানালাটাকে বন্ধ করবার কথা হতেই পারে না; কথা হচ্ছে ওই জানালাটাকে পুরোপুরি খোলা রেখেই দেশের দেয়ালে আরও যত পারা যায়, নূতন জানালা খোলা। দেশের বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে চলুক না ইংরেজিব পাশাপাশি ফরাসী, জার্মাণ, রাশিয়ান প্রভৃতি দুনিয়ার সেরা সাহিত্যগুলির ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা। দেশ ছেয়ে যাবে নূতন আলোর প্রবল বন্যায়। আধুনিক জগতের সাহিত্যগুলির মধ্যে ইংরেজিই মোটের উপর সেরা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজির একাধিপত্য তথা অতি-আধিপত্য আমাদের মনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। বিগত ইংরেজ শাসনের যুগে আমরাই যে শুধু ইংরেজিকে আয়ত্ত করেছি তা নয়, ইংরেজিও আমাদের মনকে আয়ত্ত করেছে। ফলে একদিকে আমরা ইংরেজির বাইরে তাকাতে পারছি না, অপর দিকে এই বিদেশী আগন্তুকের যেখানে প্রবেশাধিকার নেই, সেখানেও সে অনধিকার প্রবেশ করেছে, আমাদের বৈঠকখানা পেরিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে। যার স্থান থাকা উচিত ছিল শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কর্ম এবং ভক্তির ক্ষেত্রেও সে জাঁকিয়ে বসেছে। আমাদের চিঠিপত্র, কাজকারবার, ব্যবসাবাণিজ্য, অফিস-আদালত সব কিছুই চলে ইংরেজিতে। বাঙালী উকিল বাঙালি হাকিমকে মামলা বোঝাচ্ছেন ইংরেজিতে, বাঙালি শিক্ষক বাঙালী ছাত্রকে দেশের ইতিহাস

বা অন্য কিছু শেখাচ্ছেন, তাও ইংরেজিতে। এই কৃত্রিমতার চাপ দেশের মন কতদিন সইবে? ইংরেজি বই পড়ে বিলেতি বিদ্যা শিখব বই কি? তা বলে সে বিদ্যাটাকে প্রয়োগ করতেও হবে ইংরেজিতে? বিলেতি ওষুধের ইঞ্জেকশন নেব, কিন্তু তার জন্য কি সাহেব ডাক্তার না আনলেই নয়? ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে পারলেই যেখানে মনের পুষ্টি হয়, সেখানে ইংবেজিতে বুঝিয়ে উত্তর লিখতে না পারলে যদি ফেল করা হয়, সেটা কি জুলুম নয়? কালিদাসের শকুন্তলা বা শেক্সপীয়রেব ওথেলো পড়ে বাংলায় তার সাহিত্যিক মুল্যনির্ণয় করা চলবে না, করতে হবে ইংরেজিতে, একেই বলি জুলুম। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও ইংবেজি সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন বাংলায় এবং সে বিশ্লেষণ বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে নজির আমাদের মহাবিদ্যালয়গুলিতে চলবে না। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য পড়েই বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করেছেন, এই আদর্শ আমাদের শিক্ষানায়কবা অনুসরণীয় বলে মনে করেন না। আমাদের মাতৃভাষাকে বিমাতৃসদনে একটু-স্থান দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে মাতৃমন্দিরের পুণ্য অঙ্গনকে মহোজ্জ্বল করে তোলবার কবিমনোরথ উত্থায় হৃদি লীয়মান হয়েই রইল।

ইংরেজিকে আমরা ভারতবর্ষ দূরে থাকুক, আমাদের বৈঠকখানা কুইট করতেও বলব না, কিন্তু অন্দরমহল কুইট করতে অবশ্যই বলব। এই সম্মানিত বিদেশীকে বিশ্ববিদ্যার

অতিথিকক্ষে সমাদর করেই স্থান দেব, কিন্তু মাতৃভাষার নিভৃত কক্ষে তার প্রবেশাধিকার নেই। বিলেতি বিদ্যার বিদেশী জাহাজকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দবগুলিতে অবশ্যই ভিড়তে দেব, কিন্তু সে বিদ্যার দামী মালকে গাঁয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে হবে মাতৃভাষার ছোট ছোট নৌকোতে করেই। সমুদ্রের জাহাজকে গাঁয়ের খালে বিলে ঠেলে নেবার অসাধ্য কর্মে কোমব বাঁধব না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যার্থীরা ইংরেজির যোগেই জ্ঞানবিজ্ঞানেব অধিকার লাভ কববে, কিন্তু সে বিদ্যাকে দেশেব সর্বত্র ছড়িয়ে দেবেন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যোগে। দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে করতে হবে বিদেশী বিদ্যাব বাহন। আমরা বিদেশী বিদ্যাকেই চাই, বিদেশী ভাষাকে নয়। অথচ আমরা সর্বদাই ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি বিদ্যাকে অভিন্ন বলে ভুল কবি, মনে রাখতে পারি না যে, ইংরেজি ভাষাটা হচ্ছে উপায়, আব বিলেতি বিদ্যাটা হচ্ছে লক্ষ্য। উপায়কে লক্ষ্য বলে ভুল করেই আমরা গোলকধাঁধায় পড়েছি।

বিদ্যা আমদানির উপায় যদি করি ইংরেজিকে, আর বিদ্যার আদানপ্রদান ও বিস্তারের বাহন করি মাতৃভাষাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষাজীবনের অনেকখানি সময় ও শক্তি বেঁচে যাবে। বলা বাহুল্য ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা ও আলোচনার বাহনও করতে হবে মাতৃভাষাকেই, যেমন হয়ে থাকে সব দেশেই। অবশ্য ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের অর্থাৎ ইংরেজিতে লেখালেখি বা আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনও থাকবে, কিন্তু সে প্রয়োজন শতকরা একশো জন ছাত্রেরই প্রয়োজন হতে পারে না, মানসিক

প্রবণতা ও ভাবী কর্মজীবনের দাবীতে সে প্রয়োজন হবে অতি অল্প লোকেরই। মনে রাখতে হবে বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা মাত্র একুশ লক্ষ বা দুশো জনের মধ্যে একজন। অথচ একথাও সত্য যে, এই সামান্য সংখ্যার পক্ষেও ইংরেজি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যদিও ইংরেজি পড়ার ও পড়ে বিদ্যালাভের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ভবিষ্যতে দেশে শিক্ষা যখন সকলের পক্ষে আবশ্যিক হবে, তখন ইংরেজি প্রয়োগকাবীর সংখ্যা হবে আণুবীক্ষণিক। তাদেব জন্য অবশ্যই ইংরেজি প্রয়োগের শিক্ষাব্যবস্থা রাখতে হবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে। বাকী সকলে ইংরেজি পড়বে বিদ্যালাভেব উপায় হিসাবে, আর সে বিদ্যাপ্রয়োগের উপায় করতে হবে মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষাকে ভালো করে আয়ত্ত করতে পারলে ইংরেজি শিখতেও কষ্ট হবে না, সময়ও কম লাগবে, বিশেষতঃ যদি ইংরেজিও শেখানো হয় মাতৃভাষাতেই। ইংরেজিতেই ইংরেজি শেখানো, লক্ষ্যকেই উপায়রূপে ব্যবহার করা অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর ; সে চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের কত সময় ও শক্তির অপচয় হয় এবং কত শিক্ষার্থীর জীবনকে নিরানন্দ ও ব্যর্থ করা হয় তার হিসাব রাখে কে ?

যা হোক, বিদ্যালাভের উপায় যদি করি ইংরেজিকে আর মাতৃভাষাকে করি ইংরেজি শেখার তথা বিদ্যার আদানপ্রদান ও বিস্তারের উপায়, তাহলে দেশের যে শক্তি ও সময় বেঁচে যাবে, তার পরিমাণ বিপুল। সেই বেঁচে যাওয়া সময় ও শক্তিকে অনায়াসেই প্রয়োজন মত ফরাসী, জার্মাণ, চীনা প্রভৃতি বিদেশী

ভাষা, হিন্দী, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি স্বদেশী ভাষা বা অন্য যে কোন বিদ্যা শেখাবার কাজে লাগানো যাবে। তাতেই হবে ভাষার মুক্তি, শিক্ষার মুক্তি, মনের মুক্তি। এই মুক্তি ঘটতে পারে শুধু ইংরেজির জবরদস্তিকে নিরস্ত করে, তাকে বর্তমান একাধিপত্য ও অতি-আধিপত্যের আসন থেকে নামিয়ে স্বস্থানে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করলেই। একথা ঠিক যে, একদিন না একদিন ওই উঁচু আসন থেকে নেমে এসে তাকে তার নির্দিষ্ট আসনে বসতেই হবে। তাতে যত বিলম্ব হবে, ততই আমাদের ক্ষতি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে ইংরেজির জন্য নির্দিষ্ট আসন হবে সম্মানেরই, অপমানের কখনোই নয়। এমন কি সব চেয়ে বড় সম্মানেরই, যা সে পেয়ে থাকে দুনিয়ার দরবারে। ভারতের দরবারেও সেই আসনই তার প্রাপ্য। তার থেকে তাকে নামাতে গেলে দেশের বুকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। শেক্সপীয়র-মিল্‌টনের ভাষার আসনে যদি তুলসীদাস-সুরদাসের ভাষাকে বসানো হয়, তবে আমাদের তুলসীদাস-সুরদাসের যুগেই ফিরে যেতে হবে, সে যুগের রাহু এসে গ্রাস করবে আধুনিক যুগের মধ্যাহ্নসূর্যকে। সুখের বিষয়, সময়ের নদীতে জীবনের তরণীকে উজানে বইয়ে নেওয়া মানুষের সাধ্য নয়, চেষ্টা করলে নৌকাডুবি অনিবার্য। অথচ সে চেষ্টার হাওয়াই বইছে আজ চারিদিকে।

আসল কথা, ইংরেজির মতো হিন্দিকেও তার স্বস্থানে বসাতে হবে। উচ্চতর আসনের দাবী করলেই মুশকিল। ইংরেজির আসন কোথায় তার আভাস দেওয়া গেছে। হিন্দির

আসন কোথায় সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এমন একটা দাবী উঠেছে, যেন হিন্দিই ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বা স্টেট ল্যাঙ্গুএজ। এ ভাষাকে ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুএজ বলেও দাবী করা হয়। অথচ এই দুই দাবীরই কোনও মূল নেই। আমাদের সংবিধানে যে চৌদ্দটি ভাষার উল্লেখ আছে, সে কয়টাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও আমাদের জাতীয় ভাষা। পার্থক্য শুধু এই যে, ওই চৌদ্দটির মধ্যে একমাত্র হিন্দিকেই কেন্দ্রের তথা কেন্দ্র-রাজ্য ও বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পারিক সম্পর্কের সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে-কোন ভাষায় আবেদন নিবেদন করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তথাপি হিন্দি তার এই নির্দিষ্ট এলাকার সীমা ডিঙিয়ে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার দাবীতে ইংরেজির আসন দখল করতে অর্থাৎ একাধিপত্য বা অতি-আধিপত্য করতে চায় বলেই সমস্যা দেখা দেয়, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটে। কেন না ভারতীয় সংবিধান অনুসারে যে-কোনো রাজ্য নিজের কাজকর্ম চালাবার জন্যে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে পারে। হিন্দি যদি কারো মাতৃভাষার উপরে হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াসী না হয়ে নিজের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সংযত থাকে, তাহলেই আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

ভারতবর্ষের চৌদ্দটি বড় বড় ভাষার মধ্যে হিন্দি যে বিশেষ গৌরব দাবী করে, তার হেতু কি তাও ভেবে দেখা দরকাব। হিন্দির পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে সংখ্যার যুক্তি। সংখ্যার

যুক্তি মোক্ষম যুক্তি, এর বিরুদ্ধে কোনও কথা চলতে পারে না ডেমোক্রেসির যুগে। সংখ্যার যুক্তিতে পাকিস্থান হয়েছে, এই যুক্তিতেই হিন্দি ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সরকারী ভাষা হয়েছে এবং ভারতবর্ষের এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হতে চায়। যুক্তিটা এই যে, ভারতবর্ষে হিন্দিভাষীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভাষাতত্ত্ব তথা ইতিহাসের সামান্য জ্ঞানও যার আছে, সেই জানে ওই যুক্তির মধ্যে একটা মস্ত ফাঁকি রয়েছে এবং ওই ফাঁকিতেই সংখ্যাটাকে ফাঁপানো হয়েছে। আসলে হিন্দি খুব অল্প লোকেরই মাতৃভাষা আর অনেকেরই সেটা পোশাকি ভাষা মাত্র। দিল্লী-মীরাট এবং আগ্রা-মথুরা অঞ্চলের লোকেরাই বলতে পারে হিন্দি তাদের মাতৃভাষা। বাকি যারা নিজেদের হিন্দিভাষী বলে পরিচয় দেয়, হিন্দি তাদের পোশাকি ভাষা মাত্র, মাতৃভাষা নয়। আজকাল যাকে বলা হয় উত্তরপ্রদেশ পাঁচ বছর আগেও তার নাম ছিল আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ; ওই নামটাতেই তার আসল পরিচয় পাওয়া যায়। আগ্রা প্রদেশেরই ভাষা হিন্দি, অর্থাৎ ওই প্রদেশের লোকেরাই ঘরেবাইরে উভয়ত্রই হিন্দি বলে। আর অযোধ্যা প্রদেশের লোকেরা ঘরে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বলে আওধি আর বাইরে পোশাকি ভাষারূপে ব্যবহার করে হিন্দি, এরা আসলে মাতৃভাষাত্যাগী। হিন্দি আর আওধি আসলে এক গোষ্ঠীর ভাষাও নয়। হিন্দি হচ্ছে শৌরসেনী প্রাকৃতের দুহিতা, আর আওধি অর্ধমাগধীর। আর মৈথিলী, বাংলা, ওড়িয়া, আসামী প্রভৃতি হচ্ছে মাগধী প্রাকৃতের দুহিতা।

সুতরাং বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতির সঙ্গে বরং আওধির কিছু আত্মীয়তা আছে, কিন্তু হিন্দির সঙ্গে নেই। এই সব বিবেচনা করেই প্রবীণ ঐতিহাসিক পানিক্কর উত্তর প্রদেশকে আগ্রা ও অযোধ্যা এই দুই প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের সামান্য জ্ঞানও যাঁদের আছে তাদের কাছে ওই প্রস্তাব সমীচীন বলেই গণ্য হবে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ যথার্থ হিন্দিভাষী; আর পূর্বাংশ আওধিভাষী, কিন্তু তাও কাশী অঞ্চল বাদে। কাশীর ভাষা হিন্দিও নয়, আওধিও নয়, ভোজপুরিয়া। ভোজপুরিয়া মাগধী প্রাকৃতের অপত্য, অর্ধ-মাগধীর নয়। সুতরাং কাশী অঞ্চল ভাষা হিসাবে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত নয়, সে হিসাবে কাশী বিহারেরই অংশ।

পূর্বে বলেছি, অযোধ্যাবাসীরা মাতৃভাষাত্যাগী, সে হিসাবে বিহারীরা আরও বড় অপরাধী। বিহারে মৈথিলী, পশ্চিম বিহারে ভোজপুরিয়া আর মধ্য বিহারে মগহী। তিনটিই মাগধী প্রাকৃতের অপত্য; মাগধীর আর তিনটি অপত্য হচ্ছে আসামী, বাংলা, ওড়িয়া। সুতরাং ভাষা হিসাবে বিহারীরা আসামী-বাঙালী-ওড়িয়াদেরই জ্ঞাতি। হিন্দি ভাষীদের নয়। কিন্তু বিহারীরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে হিন্দি ভাষার গলায়ই মালা দিয়েছে; একেই বলে গোত্রান্তরিত হওয়া। তাছাড়া তারা নিজের ভাষাজ্ঞাতিদের দিকে মুখ ফিরিয়া রক্তসম্পর্কহীন হিন্দিভাষীদের সঙ্গেই মিতালি পাকিয়েছে। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই, এই কবি-বাণীর কি বিচিত্র উদাহরণ!

সুতরাং দেখা গেল, একমাত্র আগ্রা প্রদেশেরই মাতৃভাষা হিন্দি, অযোধ্যা প্র'দশ এবং কাশী-বিহার মাতৃভাষাত্যাগী। শেষোক্ত দুই প্রদেশের মাতৃভাষা অন্তঃপুরচারিণী, তাদের বৈঠকখানার পোশাকি ভাষা অর্থাৎ ভদ্র সমাজে ও সাহিত্যে ব্যবহারের ভাষা হিন্দি। আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও মাতৃভাষা হিন্দি নয়, হিন্দি তাঁর পোশাকি ভাষা মাত্র। যাঁরা ঘরে-বাইরে ভাষার দ্বৈতবাদী, তাঁরা কিন্তু ঘরের -কথা বাইরে বলেন না অর্থাৎ মাতৃভাষার কথা স্রেপ চেপে যান এবং নিজেদের একমাত্র হিন্দিভাষী বলেই পরিচয় দেন। তারা হিন্দির অধীনতা থেকে মাতৃভাষাকে মুক্ত করবার ইচ্ছা পর্যন্ত পোষণ করেন না। ভাষার এই দ্বৈতবাদ তাঁদের মনোজীবনকে খণ্ডিত করে কিনা, তাঁদের প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় ঘটায় কিনা সে প্রশ্ন নাই বা তুললাম। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, তাঁরা মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে নিজেদের হিন্দিভাষী বলে পরিচয় দেন বলেই হিন্দিভাষীর সংখ্যা এমন কৃত্রিমভাবে ফেঁপে উঠেছে। যা হক, তাঁরা মাতৃভাষার কথা চেপে গেলেও ভাষাতাত্ত্বিকরা কিন্তু তাঁদের ঘরের কথা বাইরে ফাঁস করে দিয়েছেন। তাতে জানা যায়, যথার্থ হিন্দিভাষীর সংখ্যা অর্থাৎ হিন্দি যাদের মাতৃভাষা' তাদের সংখ্যা যত বড় দেখানো হয়, তত বড় নয়, সব ভারতীয় ভাষার তুলনায় বেশি নয়, অন্ততঃ বাংলাভাষীর চেয়ে নয়।

দেখা গেল হিন্দির পক্ষে সংখ্যার দাবি ধোপে টেঁকে না। ভাষার বা সাহিত্যের গুণেও হিন্দি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে

অগ্রগণ্য নয়। এবিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, একজন বিশেষজ্ঞের মতে "Hindi prose literature is still feeling its way, and its standards are not yet fixed."

একথা অন্য সব ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এই অবস্থায় হিন্দিকে সহসা ইংরেজির আসনে বসাতে যাওয়া বা অন্য সব ভাষার এলাকার দিকে হাত বাড়ানো খুবই অবিবেচনার কাজ হবে। আরও কিছুকাল তাকে ইংরেজি ভাষার শাগরেদি করতে হবে এবং অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। তা হলে সে কালক্রমে সাবালকত্ব লাভ করে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার কাজ চালাতে পারবে। তার আগেই অত উঁচুতে হাত বাড়ালে নিশ্চয় গমিষ্যত্যুপহাস্যতাং লোভাদুদ্বাহুরিবঃ বামনঃ। তবু একথাও বলা প্রয়োজন যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি যতই পুষ্টিলাভ করুক না কেন, সুচিরভবিষ্যতেও সে যে ইংরেজির সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে এমন কল্পনা করতে পারি না। সুতরাং হিন্দিকে ইংরেজির আসনে বসাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাগজপত্র ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে বন্ধুতা করে চলতে হবে।

তাই যদি হয় তবে হিন্দিকে সমস্ত ছাত্রের পক্ষে অবশ্য শিক্ষণীয় করে তোলবার প্রয়োজন কি? যারা সর্বভারতীয় সরকারি কাজের জন্যে প্রস্তুত হবে তাদের পক্ষেই হিন্দি অবশ্য

শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। এমন সময় আসতে খুব বেশি দেরি হবে না, যখন দেশের সকলেই একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হবে। তখন দেখা যাবে শতকরা নব্বুই জনের বেশি লোকের পক্ষেই মাতৃভাষার যোগে শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তাদের পক্ষে ইংরেজি তথা হিন্দি হবে নিষ্প্রয়োজন। বাকি দশ জনের পক্ষে হিন্দি এবং তার মধ্যে দু-একজনের পক্ষে ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতির প্রয়োজন হবে। এই সামান্য সংখ্যার জন্যে সকলের উপরেই ইংরেজি ও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া জুলুম নয় কি? বিদেশেও দেখি মাতৃভাষার যোগেই অধিকাংশের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, সামান্য সংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর পক্ষে অন্য ভাষা শেখা আবশ্যক হয়। আমাদের দেশেও সে আদর্শ চলবে না কেন?

বাংলা ভাষার কথা ধরা যাক। এভাষার জন্ম হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে পাল-সেন রাজাদের আমলে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা মুক্তির সন্ধানে পথ খুঁজে চলছে। আজ মুক্তির কাছাকাছি এসেও তার সংশয় ঘুচছে না। কারণটা বুঝিয়ে বলছি। বাংলা ভাষার জন্মলগ্নে এদেশে দুটি ভাষার দ্বৈতরাজ্য চলছিল—সংস্কৃত ও অপভ্রংশ। রাজকার্য তথা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা চলত সংস্কৃত ভাষায়। সেখানে প্রাকৃতজনের প্রবেশাধিকার ছিল না প্রাকৃতজনের জন্যে ছিল সৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য। এভাষাও ছিল জনসাধারণের অপরিচিত, সুতরাং শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষাহীন নিম্নতম স্তরের সাহিত্যপিপাসুদের জন্যেই উদ্ভূত হয়েছিল

মাতৃভাষার সাহিত্য, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য। এই সাহিত্যও রচিত হয়েছিল অপভ্রংশেরই আদর্শে। বস্তুতঃ অপভ্রংশ রচয়িতারাই বাংলা সাহিত্যের পত্তন করেন। যা হক, একথা সত্য যে, তখনকার দিনে বাংলা দেশে সংস্কৃত অপভ্রংশ ও বাংলা ভাষার তিন ধারা চলছিল, আর বাংলার ধারাটাই ছিল ক্ষীণতম ও অবহেলিত। অর্থাৎ তখনও বিমাতৃ মন্দিরেরই এক কোণে ছিল বাংলার স্থান। তারপরে এল তুর্কি পাঠানের রাজত্বকাল। তারা নিয়ে এল বিদেশী ভাষার প্রবাহ—তুর্কি ফারসি আরবি। ক্রমশঃ ফারসি এসে দখল করল রাজতখত ; রাজকার্যে সংস্কৃতের স্থান রইল না, সে স্থান দখল করল ফারসি! রাজ সরকারের কর্মপ্রার্থী হিন্দুরাও ফারসিতে মুনসিয়ানা দেখাতে পিছপা হল না। মক্তব-মাদ্রাসায় চলল আরবি-ফারসির পঠনপাঠন। ওদিকে টোল চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতরা চালালেন সাহিত্য দর্শন-স্মৃতি-আয়ুর্বেদের চর্চা সংস্কৃত ভাষায়। আর বাংলা থাকল অবহেলিত পল্লীজনের জন্য, তার শিক্ষাব্যবস্থা পাঠশালায়। এ যুগেও তিন ভাষার আধিপত্য, আর বাংলার স্থান সর্বনিম্নে। কিন্তু এ যুগে চৈতন্য-প্রমুখ ধর্মনায়কদের প্রবর্তনায় ও অন্যান্য কারণে জনসচেতনতা প্রবলতর এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কৃপায় বাংলা ভাষাও পুষ্টতর হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে ইংরেজের আমলে ফারসির প্রভাব তিরোহিত এবং সংস্কৃতের প্রভাব ক্ষীণতর হল। তার জায়গায় এল ইংরেজির প্রভাব প্রচণ্ডগতিতে। তার পাশে পাশে বাংলার স্রোত চলল ক্ষীণবেগে। ইংরেজির প্রভাবে ভালো মন্দ

দু-রকম ফলই হল। কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রেরণাই জুগিয়েছে, আধিপত্য করেনি। ফলে বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। কিন্তু কর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজি বাংলা-সাহিত্যকে প্রেরণা না জুগিয়ে তাকে চেপে মারতেই চেষ্টা করেছে। ইংরেজ আমলে বাঙালি যে ইংরেজি সাহিত্য রচনা করেছে, তাব বিপুলতা বিস্ময়জনক। ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়ে বাঙ্গালী যা লিখেছে, তার পৌনে ষোলো আনাই তো ইংরেজিতে এবং বাংলা সাহিত্য তথা বাঙ্গালি জাতি সেই পরিমাণেই বঞ্চিত হয়েছে। রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র যদুনাথ জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষাকে বঞ্চিতই করেছেন। আর রাজকার্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মের ক্ষেত্রে বাংলা তো প্রবেশাধিকার পায়নি। একমাত্র রসের ক্ষেত্রে বিচরণ করে একটা ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে জ্ঞান এবং কর্মের বাহকও হতে হবে। আশা হচ্ছিল ইংরেজের তিরোধানের ফলে বাংলা ওই দুই ক্ষেত্রেও তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবে, হাজার বছরের পরপীড়নের পর সে এবার জ্ঞানকর্মভাব এই তিন বিভাগেই তার শক্তি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেবে। কিন্তু এখনও ইংরেজি তার দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করেনি এবং অপরদিকে হিন্দি তার এলাকা প্রসারণ করতে উদ্যত হয়েছে।

আদি যুগে সংস্কৃত ও অপভ্রংশের চাপে বাংলা ছিল সংকুচিত ও সংকীর্ণ। মধ্যযুগে ছিল ফারসি ও সংস্কৃতের প্রভাব, কিন্তু সে প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম ; তাই বাংলার প্রসার হল অপেক্ষাকৃত সহজ। তৃতীয় যুগে ইংরেজির চাপ এল বটে, কিন্তু প্রেরণাও এল। ফলে বাংলার পূর্ণবিকাশ বাধা পেল, কিন্তু তার আংশিক বিকাশই হল বিস্ময়কর। বর্তমান যুগে যদি ইংরেজির প্রেরণাটুকু বজায় রেখে তার চাপকে নিরস্ত করা যায়, আর হিন্দিরও স্পর্শটুকু রেখে তার এলাকাকে যথাস্থানে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, তাহলে শুধু বাংলা ভাষারই কল্যাণ হবে না তার প্রভাবে হিন্দি ভাষাও সমৃদ্ধ হবে। আর ভাষার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে মনের মুক্তি ও জাতীয় জীবনের বিকাশ।

সাহিত্যের মুক্তি

সাহিত্যশক্তিই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। কেননা সাহিত্যের মধ্যেই জাতীয় মননশক্তির সমবায় ঘটে। আর মননশক্তিই যে মানুষকে সর্ববিধ জড়শক্তি ও পেশীশক্তির উপরে আধিপত্য দিয়েছে, একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে মননশক্তির জাগরণ ঘটেনা সেখানে জড়শক্তি ও পেশীশক্তির সংহতি সম্ভব নয়। সাহিত্যই মানুষকে সর্বাধিক মারাত্মক বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে। সাহিত্য যেখানে জাগ্রত ও সক্রিয় নয় সেখানে আত্মবিচ্ছেদের অসংখ্য ফাঁক দিয়ে মানুষের সব শক্তিই নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই তার প্রমাণ বিকীর্ণ হয়ে আছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে জাতিব সাহিত্যশক্তি যত গভীর ও নিবিড় সে জাতি ভীষণতম রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগের মধ্যেও অভ্যুদয়ের অধিকারী হয়। এই সাহিত্যশক্তিই জাতিকে সর্বতোমুখী মুক্তির পথে প্রেরণা দেয়। ইংরেজ জাতির ইতিহাসই একথার সব চেয়ে সংশয়াতীত সাক্ষ্য বহন করে। সেই ইংরেজ এদেশে এসেছিল একহাতে শাসন-দণ্ড এবং আর এক হাতে সাহিত্যমুক্তির বাণী নিয়ে। এই বাণী সঞ্চারিত হয়েছিল আমাদের সাহিত্যে। আমাদের মনে যেদিন থেকে সাহিত্যের শক্তি উদ্যত হয়ে উঠল সেদিন থেকেই ইংরেজ শাসনশক্তির অবসান সূচিত হয়েছিল, একথা যেন কখনও না ভুলি।

আমাদের দেশে এই সাহিত্যেব জাগরণ ঘটেছে, কিন্তু মুক্তি ঘটেনি। কেন ঘটেনি, না ঘটার ফল কি হয়েছে, আর সে মুক্তি ঘটাবার উপায় কি তা ভেবে দেখার সময় বয়ে যাচ্ছে।

মানুষ প্রাণবান জীবমাত্র নয়, সে মনোবান। প্রাণী হিসাবে সে জন্মায় স্বদেশের মাটিতে, মনোবান জীব হিসাবে তার আবির্ভাব স্বভাষার ভূমিতে। তাব প্রাণলীলার ক্ষেত্র স্বদেশের মাটি, আর মনোলীলার প্রকাশ স্বভাষার বঙ্গমঞ্চে। মাতৃভূমির কোলে দেহ জীবনের পরিবৃদ্ধি, আর মাতৃভাষার আশ্রয়ে আমাদের মনোজীবনের অভিব্যক্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামেব ফলে আমাদের মাতৃভূমি সুচিরকালীন বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আমাদের জননেতারা তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার বন্ধনদশা মোচনের কোনো পরিকল্পিত প্রয়াস কোথাও দেখতে পাই না। অথচ একথা ধ্রুব সত্য যে, ভাষার মুক্তি ছাড়া শুধু দেশের মুক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থকতার সন্ধান দিতে পারবে না। মন যেখানে মুক্ত নয়, সেখানে দেহের মুক্তি কি করতে পারে? অমৃতলোকের সন্ধান পেতে হলে মনের মুক্তি চাই। মনে আছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার যুগে ইংরেজ লাটকে লক্ষ্য করে যেসব গান করা হত, তার একটি লাইন হচ্ছে এই—

ফুলার, আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন রয়॥

আজ কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে তার উল্টো কথা।—

দেহ মোদের স্বাধীন বটে, মন তো স্বাধীন নয়। সুতরাং আমাদের ভয়ের কারণ আজও রয়েছে। কেননা ইংরেজের প্রভাব গিয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজিব প্রভাব যায়নি। যাবার নামও করে না। ইংরেজের শাসন ছিল স্থূল, তাই তার বন্ধন ছেদন কঠিন ছিল না। কিন্তু ইংরেজির শাসন সূক্ষ্ম, যে শিকল দিয়ে সে মনকে বেঁধেছে তা অদৃশ্য, তাই তার বাঁধন কাটার কথা মনেও হয় না। ডাকাতের ভয় দূর করা যায়, কিন্তু ভূতের ভয় কিছুতেই ছাড়ানো যায় না, মনের মজ্জাতে তার আশ্রয়।

ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করা চলে, তাকে কাবু করা যায়। ভূতের সঙ্গে লড়াই চলে না, তাকে কাবু করাও সম্ভব নয়। ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় দিনের আলোর আশ্রয় গ্রহণ। আজ চিন্তাহীনতার গাঢ় অন্ধকার আমাদের মনকে চারিদিক থেকে কেবলই বিভীষিকা দেখাচ্ছে ; কবে যে আমাদের মনের পূর্ব দিগন্তে জ্ঞানের আলো ঝিকিয়ে উঠে সব বিভীষিকার অবসান ঘটাবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি।

একথা আমরা ভুলে যাই যে, মানুষের জীবনযাত্রার ন্যায় একটা মননযাত্রাও আছে, যদি না থাকত, তবে আমরা চির-কালের জন্য ইতিহাসের আদিম পর্বেই থেকে যেতাম ; এমনকি ডারউইনের থিওরিও কিছুদূর পর্যন্ত সত্য হয়ে আর এগোতে পারত না। পশুদেরই আছে একমাত্র জীবনযাত্রা, সেই পশু যে দিন মননযাত্রার পথে পা বাড়াল, সেদিন থেকেই মানুষের যথার্থ আবির্ভাব। জীবনযাত্রার এক চাকার গতি অস্থির, সেই

চাকায় চড়ে ভাবতব্যতার অভিমুখে যারা যাত্রা করেছিল, কালের মোড়ে মোড়েই তাদের পতন ঘটেছে; ইতিহাস-পথের আশে-পাশে তাদের কঙ্কালাবশেষ আজও মাঝে মাঝেই আমাদের চোখে পড়ে। নিছক জীবনের সঙ্গে মননকে জুড়ে দিয়ে মানুষ যেদিন দুই চাকার রথে চড়ে বসল, সেদিন থেকেই তার অগ্র-গতি সুস্থির অথচ দ্রুত হয়ে উঠল। এক চাকার আবর্তনে শুধু গতিই আছে, স্থিতি নেই; প্রতি মুহূর্তেই তার পতনের আশঙ্কা। দুই চাকার রথের আরোহী স্থির থেকেও গতিশীল; তার অতি-ক্রমণে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য থাকে। মুহুর্মুহু পতনের আশঙ্কা তার মনকে নিত্য বিচলিত করে না। জীবন ও মননের দুই চাকার রথে চড়ে মানুষ যেদিন ইতিহাসের বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করল, সেদিন থেকে

স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে;
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

সেদিন থেকে মানুষ স্থির থেকেও নিত্য বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। জীবন ও মননের সমন্বয়েই আসে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য। মানুষের রথচক্র যে ঐ সমন্বয়ের পথ থেকে রেখা-মাত্রও বিচলিত না হয়ে কল্যাণের দিকে নিত্য এগিয়ে চলেছে, এমন কথা বলছি না। দেশে দেশে যুগে যুগে ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার বহু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। যেখানেই জীবন ও মননের সমন্বয়ে ত্রুটি ঘটেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে মানুষের দুর্গতি। কোথাও তার রথগতি অবল্পিত বেগলাভ করে ইতিহাসের মোড়ে এসে মানুষকে বিনাশের অতল গহ্বরে

নিক্ষেপ করেছে ; জানি না আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তারই পুনরাবৃত্তির পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে কিনা। কোথাও জীবন-মননেব সমন্বয় ব্যাহত হয়ে ইতিহাস-পথের মাঝখানেই রথের চাকা ভেঙে গিয়ে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, যেমন হয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষে। ওই চাকা-ভাঙা রথে ব'সেই আমবা কিছুকাল যাবৎ তারস্বরে নানারকম আস্ফালন করছি, যারা আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, পরুষকণ্ঠে গালাগালি করেও তাদের নাগাল পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না,—অবশেষে হতাশ হয়ে দ্রাক্ষালুব্ধ বিফলকাম শৃগালের মতোই বলছি, যারা দ্রুত এগিয়ে গেল, ঐতিহাসিক বিনাশের মধ্যেই তাদের শেষ পরিণতি। আবার কেউ কেউ আমরা ঐতিহাসিক গতিলাভের আশায় রথের মুখটাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে দেবাব উদ্দেশ্যে ভাঙা চাকা ধরেও কম টানাটানি করিনি। বঙ্কিম-ভূদেবের আমল থেকে এই সেদিন পর্যন্তও এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কি করুণ দৃশ্যেরই অবতারণা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সুখের বিষয় অবশেষে আমাদের নেতাদের দৃষ্টি পড়েছে রথের ভাঙা চাকার দিকে। রব উঠেছে, 'চাকা মেরামত করা চাই, চাকা মেরামত করা চাই।' তার জন্য বহু মহলা পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে, ভাঙা চাকাতে হাত লাগানও হয়েছে। কিন্তু কোন্ চাকাটাতে ; জীবনের না মননের ? কোন্ চাকা ভেঙে যাওয়ার ফলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির রথ ইতিহাসের মধ্যপথে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ? আমি বলি আমাদের মননের চাকাটাই বিকল হয়ে গিয়েছিল,

তাই জীবনের চাকাটাও স্তব্ধ অচল হয়ে পড়েছে। ইতিহাসই এই সত্যের সাক্ষী। কিন্তু এখানে ঐ সাক্ষীকে জেরা করবার সময় আমাদেব নেই। সুতরাং আমাদের মনন-চাকার বিকলতার কথাই সত্য বলে মেনে নেব। কিন্তু আমাদের নেতাদের মুখে কি কথা শুনছি? আমরা কি নিত্যই শুনছি না যে আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে, নতুবা আমাদের বাঁচোয়া নেই; আমাদের বাঁচনের মান, Standard of living বড়ই নীচু, তাকে উঁচু করতেই হবে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইত্যাদি? আমরা যাকে বাঁচন বলি, সেটা এদেশেব মরণের পর্যায়েই নেমে এসেছে- তার প্রতিকার চাই—একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কি উপায়ে? রোগী জীবনশক্তি হারিয়ে মুমূর্ষু দশায় এসে পৌচেছে। তাকে বেশী করে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে, না তার রোগের বীজ নষ্ট করতে হবে? বস্তুত তাকে পথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ওষুধ দিয়ে তার রোগ দূর করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার বাঁচবার, বলিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায়, অন্য পথ নেই। আমাদেরও আজ ওষুধ-পথ্য দুই চাই; তা না করে শুধু ভুরি ভোজনের ব্যবস্থায় মন দিলে প্রত্যবায়ই ঘটবে। আমাদের দেশে আজ জীবনের মান এত নেমে গেছে, কারণ মননের কোনো মানই নেই। যদি জীবনের মান রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রথমেই মননের মান বাড়াতে হবে। পশ্চিম ভূখণ্ডে মানুষ মনন ও বুদ্ধির বলে দেশকালের ব্যবধানকে প্রায় শেষ করে এনেছে। আর আমরা অমনন ও অবুদ্ধির সহায়তায় জীবন-মরণের ব্যবধানকেই প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছি—এটাই

আমাদের চরম কৃতিত্ব! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাদের এই কৃতিত্বের কথাই অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অথচ আমাদের দেশে একদিন মনন ও বুদ্ধির গৌরব দৃঢ় স্বরে ঘোষিত হয়েছিল। ইংরেজি প্রবাদে আছে, জ্ঞানই বল। বস্তুতঃ জ্ঞানবলের চেয়ে বড় বল আর কিছু নেই। আমাদের দেশের বালক-পাঠ্য হিতোপদেশ গ্রন্থেও অনুরূপ কথা আছে।—

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্‌।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

এই হিতবাক্যে আমরা কর্ণপাতও করিনি, ফলে সিংহ-শশকের অলীক গল্প ঐতিহাসিক সত্যের রূপ নিয়ে আমাদের কাছে সমুপস্থিত হল। ইংরেজ-শশক ভারত-সিংহকে বুদ্ধিবলে পর্যুদস্ত করে প্রায় দুশো বৎসর রাজত্ব করে গেল। তবু কি আমাদের চেতনা হয়েছে? এই যুক্তিতেও যদি প্রত্যয় সঞ্চার করতে না পারি তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে আপ্তবাক্যের আশ্রয় নিতে হবে। (কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কেননা শাস্ত্রবাক্যকে অনেক সময়েই ভেলকির অরেকল বা ম্যাকবেথের ডাইনি-বচনের ন্যায় বিভিন্নার্থে গ্রহণ করা যায়, আর যে সমুদ্র মন্থন করে বিপরীতার্থক বাক্য-রাশির উদ্ধার করা না যায় তা শাস্ত্রপদবাচ্যই নয়)। উপনিষদে বলা হয়েছে, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে।" পরমার্থিক কল্যাণ লাভের সহায় যে পরাবিদ্যা তাকেই এখানে বলা হয়েছে বিদ্যা আর ঐহিক কল্যাণ লাভের সহায় যে অপরা বিদ্যা তাকে বলা হয়েছে অবিদ্যা। এই মৃত্যুতরণ অপরা বিদ্যার প্রসাদেই প্রতীচ্য জনপদবাসীরা অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর

হয়েছে। আর আমরা ঐহিক অপরা-বিদ্যাকে অস্বীকার করে পরাবিদ্যার কৃপায় এক ধাপেই অমৃতলোক প্রাপ্তির অত্যাকাঙ্ক্ষায় ও দুশ্চেষ্টায় একেবারে মৃত্যুলোকের কিনারার এসে অবতীর্ণ হয়েছি। তাইতো আমাদের কবিকে প্রাচীন ভারতের কাছে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা জানাতে হয়েছে—

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

মৃত্যুতরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইহনিষ্ঠ অপরাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ। এই অপরাবিদ্যার প্রসাদ লাভ বুদ্ধিচর্চাসাপেক্ষ। অথচ 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' ইত্যাদি •আরামপ্রদ মিঠে বুলির সাহায্যে বিশ্বাস ভক্তি ও মোহের দেশজোড়া কাঁথা চাপা দিয়ে আমাদের খোকা-বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছি আর গুণ গুণ সুরে কেবলি বলছি—

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজ্‌না দেব কিসে ?

খাজনা দিতে হচ্ছে দারিদ্র্য দিয়ে, দুর্ভিক্ষ দিয়ে, মহামারী দিয়ে। অথচ একদিন ভারতবর্ষ যখন সজীব ছিল, জাগ্রত ছিল, উদ্যত ছিল, তখন এদেশে অবিদ্যার চর্চা ছিল নিরন্তর, বুদ্ধির শিখা ছিল অস্তমিত। তাই তো গীতাকার বলেছেন—

'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'

কেননা

'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'।

বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর, নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ যে আমরা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি তার মূলে রয়েছে বুদ্ধিচর্চার প্রতি দীর্ঘকালব্যাপী বিমুখতা। আবার আপ্ত বাক্যের, আশ্রয় গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে ঋষিবাক্যতুল্য বলেই মনে করি। তাই আপ্তবাক্য হিসাবে তাঁর উক্তিই উদ্ধৃত করছি।—

'বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে। শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে —"স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুনক্তু," তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে সংযুক্ত করুন।"

ভগবানের কাছে এই যে বুদ্ধির বর প্রার্থনা, তার কারণ অবুদ্ধিই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্গতির মূল।

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।

ভগবান নিজে এসে মানুষকে রক্ষা করেন না, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণা দিয়েই তাকে রক্ষা করেন। বিপদকে জয় করবার একমাত্র আয়ুধ হচ্ছে বুদ্ধি, হিতোপদেশের এই হিতবাক্য আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বুদ্ধিহীনকে যে স্বয়ং বিধাতাও সৌভাগ্য দান করতে পারেন না, একথা হরপার্বতী সংবাদের সুপরিচিত কাহিনীতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

করতলগত সৌভাগ্যও যে বুদ্ধির দোষে ফসকে যেতে পারে, সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচাতে হলে একথা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি 'সাবধান' বাণী আজ আমাদের বিশেষ করে স্মরণ কবার প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই

সমস্ত ভারতবষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসেছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হ'ল উপলক্ষ্য ...বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। জীবন-যাত্রার পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যেস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবেব ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাঁদের ঢেকিলীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে মাথা কুটে মববে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবতন ঘটবে—এইমাত্র প্রভেদ।

—সমস্যা, কালান্তর

●

ভয়ংকর অপ্রিয় কথা, কিন্তু সত্য। সেইজন্য বিশেষ করে স্মরণীয়। অপ্রিয় কথা শোনাবার মত হিতৈষী জগতে দুর্লভ।

আজ ভৌগোলিক ভারতবর্ষ পরবশতার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু সংস্কৃতিগত চেতনাময় ভারতবর্ষে পরবশতার অবসান ঘটেছে কি? সেখানে কি এখনও মনুমান্ধাতার সমাজ বিধান,

বিকাশ ঘটত সব চেয়ে বেশী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, আধুনিককালের পাশ্চাত্য জগতে মনন শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলেই সেখানে জীবন-মানেরও এমন অভাবিতপূর্ব উন্নয়ন ঘটতে পেরেছে। ট্রেন-ষ্টীমার এরোপ্লেন সিনেমা-রেডিও প্রভৃতি যে সব সরঞ্জাম মানুষের জীবনমানের ক্ষেত্রে এমন অবিশ্বাস্য রকম বিপ্লব ঘটিয়েছে, তা তো মনন বিকাশেরই প্রত্যক্ষ ফল, জীবন শক্তির নয়। জীবনকে উপবাসী রেখে জীর্ণ দশায় এনে ফেলে মননের উন্নয়ন করতে হবে এমন বাতুলতা আমি করছি না; একথা বলাই বাহুল্য। আমি বলছি সভ্যতার সবপ্রকাব সাজসরঞ্জাম আমদানী করলেই দেশে মননের উন্নয়ন হবে না, অন্তরের স্বাধীনতা আসবে না, আর, তা না হলে আমাদের দুঃখ-রজনীরও অবসান হবে না। কেননা, যে আত্মবশ্যতা সর্বসুখের উৎস তারই নামান্তর অন্তরের স্বাধীনতা, ইউরোপের মননশক্তি-প্রসূত আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণই আজ অসভ্য বর্বর আদিম অধিবাসীদেরও ভোগে লাগছে। তারাও ট্রেনে চড়ছে, টেলিগ্রাম পাচ্ছে, রেডিও শুনছে, সিনেমা দেখছে, এমনকি তারা ওসব যন্ত্রপাতি চালনাও করছে। কিন্তু তা বলেই তারা যে সভ্যতারও অধিকারী হয়েছে একথা বলা মোটেই চলে না। আসলে তারাও ওই যন্ত্রপাতির অঙ্গবিশেষে পরিণত হয়েছে এবং পরের নির্দেশে চালিত হচ্ছে। অতএব ভেবে দেখতে হবে আমাদের দেশে এই যে বহুবিধ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে, তাতে সত্যই আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হবে কি না। আর যাই হোক, তাতে মনের দারিদ্র্য

ঘুচবে না ; আর মনের দৈন্য যতদিন থাকবে ততদিন দুঃখ লাঞ্ছনাও আমাদের ছাড়বে না। সভ্যতার সরসরঞ্জাম আমদানী বা উৎপাদন যতই হোক না কেন, আমাকে বলতেই হবে, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর', যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' সভ্যতার সম্পদ আর চিত্তের সমৃদ্ধি এক কথা নয়। তাইতো প্রত্যক্ষতঃই দেখতে পাচ্ছি বর্তমান জগতের মানস-সরসী তীরে আধুনিক কালের অলকাপুরী আমেরিকাতেও।

মনিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।

নতুবা মর্ত জগতের এই আমেরিকা-পুরীতেও আত্মহত্যার হিড়িক এখন নিত্যব্যাপার হয়ে দাঁড়াল কেন ? বস্তুতঃ বাইরের সম্পদে চিত্তের দৈন্য ঘোচে না, আর চিত্তের দীনতা না ঘুচলে দুঃখ দুর্গতিরও অবসান নেই। অন্তরের সম্পদ, চিন্তার স্বাধীনতা যার নেই, রাজাসনে বসেও সে স্বাধীন হয় না। এইজন্যই ইংরেজ রাজত্বের অবসানে দেশব্যাপী স্বাধীনতার মধ্যে থেকেও আমরা যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি না। বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের জিভ স্পর্শ মাত্রই সুপরশের স্বাদ পায়, কিন্তু কাষ্ঠময় বা তৈজসদর্বী সুপরশের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও তার স্বাদ পায় না, কারণ সে শক্তিই তার নেই। আমাদের সেই দশা অহরহ স্বাধীনতার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আমাদের নির্জীব মন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে না। তাই বলছিলাম, আমাদের মনকে সজীব করে তোলা চাই। সচেতন করে তোলা চাই। মনন শক্তিকে

সক্রিয় করে তোলা চাই। তাহলেই আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাব, তার সদ্ব্যবহার করতে পারব। নতুবা শবের গলার মুক্তাহারের সে মতোই সে স্বাধীনতা আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং নিজেদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গঠন করেছি। সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনকল্যাণ এবং কল্যাণ সাধনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপায় কি এবং কোন রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র বলে স্বীকার করব? এই আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্‌ধৃত করি।—

আজকালকার দিনে সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি, যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশে বল লাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে।

—সমাধান, কালান্তর

রাষ্ট্রনীতির এই আদর্শকে বলা যায় সর্বোদয়ের আদর্শ। কিন্তু তা সর্বজনের সেবা করে নয়, তাকে সুখ সম্পদ দান করে নয়, সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, তার আত্মবিশ্বাসকে উদ্‌বুদ্ধ করে। সর্বজনকে স্বাধীন বুদ্ধির অধিকারী করেই তাকে স্বায়ত্তশাসনের ও যথার্থ মুক্তির স্বাদ দিতে হবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের জনকল্যাণ প্রচেষ্টার মধ্যে বুদ্ধি জাগাবার কোনো অভিপ্রায় দেখতে পাই না। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের যোগে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসাদ বিতরণের ব্যাপক অভিপ্রায় নেতাদের চিত্তকে অধিকার করেছে। কিন্তু জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি খোলবার অভিপ্রায় দেখি না। অথচ বৈজ্ঞানিক সম্পদ লাভের চেয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিলাভ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। কেননা ওই দৃষ্টিলাভের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ স্বাধীনতার কল্যাণ সম্পদ।

বাঙলা দেশে দামোদর-ময়ূরাক্ষীর জলস্রোতকে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলে বেঁধে তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দেশের মাটিকে শ্যামল করে সম্পদ বৃদ্ধির যে সাধু প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু ওদিকে আমাদের গ্রামে গ্রামে সমাজের স্তরে স্তরে চিত্তস্রোত শুকিয়ে গিয়ে দেশব্যাপী অনুর্বরতার অভিশাপ যে সমগ্র জাতিকে মানসিক নিত্য দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করছে, তার প্রতিকারের কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা কোথাও দেখতে পাই না। নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে দেশকে শস্যসম্পদশালী ও লোকালয়কে বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত করা চাই বইকি। কিন্তু জনসাধারণের

মনন স্রোতকেও তেমনি পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগিয়ে জাতীয় চিত্তভূমিকে সমৃদ্ধ ও সর্বজনের মনের কক্ষকে বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকিত কবাও চাই। বরং এই মনন শক্তির উদ্‌বোধনই চাই সর্বাগ্রে ; কেননা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশক্তি চালনার মূলেও থাকে মনন শক্তিরই ক্রিয়া। মনন শক্তিকে যথোচিত-ভাবে উদ্‌বুদ্ধ না করে যন্ত্রশক্তিকে চালাতে গেলে বিভ্রাটও ঘটতে পারে, অন্ততপক্ষে যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রসাদও যে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না এটা নিঃসন্দেহ।

সুতরাং যথার্থভাবে জনকল্যাণ করতে হ'লে দেশেব মনন শক্তিকে, বুদ্ধিশক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, তাকে কাজে লাগাতে হ'বে। তার উপায় কি ? তার উপায় শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার এবং সাহিত্যের মুক্তিবিধান। শিক্ষা ও সাহিত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার হলেই সাহিত্যেরও উন্নতি ও প্রসার ঘটে কার্যকারণ সম্বন্ধের জোরেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটতে পারেনি, ইংরেজের প্রভাবে ও ইংরেজির মোহে। বিষয়টা আরও একটু খুলে বলা দরকার।

মুখ্যত মানুষের মনন শক্তির উদ্‌বোধনের নামই শিক্ষা আর মানুষের মনন সম্পদের চিরন্তন ভাণ্ডারের নামই সাহিত্য। সুতরাং, এ-দু'টি যে পরস্পর-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের শিক্ষার দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতার ফলেই সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারেনি। এখানেই বলে রাখছি, সাহিত্য বলতে আমি শুধু রসসাহিত্যই

বুঝি না, ব্যাপকার্থে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার মননসম্পদকেই আমি সাহিত্য বলে গণ্য করি। এই ব্যাপকার্থ গ্রহণ যে অন্যায় নয়, একথার সমর্থনে আমাদের সাহিত্য সম্মেলনগুলির ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

আগে শিক্ষার কথাই বলি। আমাদের শিক্ষার প্রধান দোষ দু'টি তার অগভীরতা ও সংকীর্ণতা। আমরা যে শিক্ষা পাই তা সাধারণতঃ ব্যবহারিকতার বাহ্য প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে না, চিত্তকে সুনিয়ন্ত্রিত করে না এবং চরিত্রকেও গঠন করে না। তাছাড়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিক থেকেও সে শিক্ষা সংকীর্ণ, আর সমাজগত ব্যাপ্তির দিক থেকেও তা নেহাৎই অপরিসর—এ শিক্ষা সমাজের উর্ধ্বতন স্তরের অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশের পনেরো আনা লোকই এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত। শিক্ষার এই বিবিধ দোষেরই মুল কারণ একটি বৈদেশিক ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতা। দুর্বোধ্য বেদমন্ত্রের মধ্যস্থতা যেমন ভক্ত ও ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগের অন্তরায় ঘটায়, ইংরেজি মধ্যস্থতাও তেমনি শিক্ষিতব্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘটায়। ফলে এই কৃত্রিম শিক্ষা আমাদের ব্যবহারে যদিবা লাগে, মর্মে কখনও লাগে না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত মন্ত্রের মতোই ইংরেজি বিদ্যাও আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেক দুস্তর বিচ্ছেদ রচনা করেছে। ফলে আমরা 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'; আমাদের শিক্ষিত

সমাজের কাছে ইংরেজিই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ঘরের কাছের অশিক্ষিত প্রতিবেশীরা দূরবর্তী গ্রহের চেয়েও দূরবর্তী ---দূরবীণ লাগিয়েও তাদের হৃদয়ের দেখা আমরা পাইনা। যে দেশের শিক্ষার এই অবস্থা সে দেশের সাহিত্যের অবস্থাও যে ভালো হতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। রোগী যখন মরণ-দশায় পড়েও রোগের যন্ত্রণা বোঝে না, তখনই তার অবস্থা হয় শোচনীয়। আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। আমরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু তার গলদ যে কোথায় তা বুঝতেও পারি না, প্রতিকারের চেষ্টা তো কল্পনারও অতীত।

সাহিত্য মানুষের শিক্ষা তথা মনোজগতেরই প্রতিরূপ। শিক্ষায় ও মননেই যেখানে গলদ রয়েছে, সাহিত্য সেখানে পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। বাঙলা সাহিত্যকে একটুখানি পরখ করলেই তার অভাব ধরা পড়ে। প্রথমতঃ তার অব্যাপ্তি, যে বাঙলা সাহিত্যের আমরা গর্ব করি, তা কয়জন বাঙালীর সম্পদ? শতকরা পাঁচজনেরও কিনা সন্দেহ। তাই যদি হয়, তবে এই সাহিত্য বাঙালী জাতির কোন্ কল্যাণসাধন করবে? বাঙলা সাহিত্যকে বাঙলা দেশের সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলা চাই। নতুবা এ সাহিত্য আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যেসব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তার তলাটা হাল্কা হলে চলে না। সেসব জাহাজের তলায় ভারী মাল বোঝাই করে জাহাজকে গভীর জলের মধ্যে স্থিতিদান করা হয়। তলা ভারী না হলে অর্থাৎ ব্যালান্স না থাকলে মাথাভারী জাহাজ ঝড়-তুফানের আঘাত সইতে পারে না, সহজেই কাত হয়ে তলিয়ে যাবার

আশঙ্কা থাকে। আমাদের মাথাভারী বাঙলা সাহিত্যেরও সেই দশা। তার তলায় ব্যালান্স নেই, জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরতায় তার প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা নেই। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কখনও দুর্যোগ দেখা দেয়, তা হলে এ সাহিত্যও রক্ষা পাবে না, আমাদেরও সে রক্ষা করতে পারবে না— এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি পরিসরও বড়ই সঙ্কীর্ণ। একে সাহিত্যসৌধ বা সাহিত্য পিরামিড না বলে সাহিত্যস্তম্ভ বলাই ভালো। কীর্তিস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু কীর্তিসৌধ কখনও নয়। সমগ্র জাতীয় চিত্তকে আশ্রয় দেবার মত প্রশস্ত কক্ষ তার নেই। কেননা, বাঙলা সাহিত্য একাঙ্গীণ; একমাত্র কবি-কল্পনাকে আশ্রয় করেই সে স্তম্ভের মত একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধিও খুব বেশী নয়। একমাত্র রসচর্চাকেই সে আশ্রয় করেছে, মননকে সে এখনও স্বীকার করতে পারেনি। বহু-মহলা ইংরেজি সাহিত্যে মননের বিভিন্ন রত্নকক্ষে যে অজস্র সম্পদের সন্ধান মেলে, বাঙলা সাহিত্যে তা আমরা আশাও করি না। কেননা, আমরা ধরে নিয়েছি যে, বাঙলায় শুধু কাব্য গল্প ও নাটকই হতে পারে, উচ্চাঙ্গের মনন সাহিত্য রচনা করতে হলেই ইংরেজির আশ্রয় নিতে হবে। কেন এমন হল? হল এইজন্য যে, উচ্চশিক্ষায়'এখনও আমরা বাঙলাকে একমাত্র রস-সাহিত্যের কোঠাতেই এক-ঘরে করে রেখেছি—ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের কক্ষে তার প্রবেশাধিকার নেই। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মন্দিরে নরশার্দুল আশুতোষের যে মর্মর মূর্তি

প্রতিষ্ঠিত আছে, তার গায়ে লিপিবদ্ধ আছে এই প্রশস্তি বচন—

His noblest achievement, surest of all
The place of his mother-tongue in
step-mother's hall.

আমাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির যে আমাদের বিমাতার অর্থাৎ ইংরেজিরই মন্দির, একথা অসঙ্কোচেই স্বীকার করা হয়েছে। তারই এক কোণে দীনা মাতৃভাষার একটুখানি স্থান করে দিয়েছেন, এটাই আশুতোষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজের রাজত্বকালে এটুকু করাতেও যথেষ্ট দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়েছিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু আজও যে আমরা ঐশ্বর্য-শালিনী বিদেশিনী বিমাতার ষোড়শোপচার পূজার্চনার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে তার পদপ্রান্তে দীনা মাতৃভাষাকে (যার স্তন্যরসে আমাদের জীবন-মন গঠিত হয়েছে) একটুখানি আশ্রয় দিয়েই পরিতৃপ্ত রয়েছি, তার চেয়ে কলঙ্কের বিষয় আর কি হতে পারে? মাতৃ-অবমাননা ও বিমাতৃ-বন্দনার এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি?

মনন সাহিত্যচর্চা ও রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার এই যে অতিপ্রাধান্য তার হেতু কি? প্রথম হেতু ইংরেজের স্বীকৃতি। রাজার জাতির স্বীকৃতিতে উৎসাহিত হয়ে আমরা শতাধিক বৎসর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত চর্চাই বিদেশী বিমাতৃ ভাষাতেই করে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ আমাদের মনের জড়তা; জড়ের প্রধান ধর্ম এই যে, কোনো শক্তি তাকে একবার যেদিকে গতি দান করে, সে নিজের শক্তিতে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য

পথ ধরতে পারে না। ইংরেজের হাতের অর্থাৎ মেকলের হাতের ঠেলা খেয়ে আমাদের মন শতাধিক বৎসর ধরে যে-পথে চলেছে, নিজের জড়তাবশতঃ সে ও-পথ ছেড়ে অন্য পথ বেছে নেবার কথা ভাবতেও পারে না। বরঞ্চ সেই অভ্যস্ত পথকে আঁকড়ে থাকবার অনুকূলেই নানা যুক্তির অবতারণাও করে। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, ইংরেজিই সমস্ত ভারতবর্ষকে ঐক্যদান করেছে এবং ইংরেজিই সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করেছে। ইংরেজির আশ্রয় ত্যাগ করলে ভারতীয় ঐক্য এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগ নষ্ট হবে, আর তাতেই ঘটবে আমাদের মহতী বিনষ্টি। ছোট কাপড়ে মোটা দেহের একাংশ ঢাকতে গেলে অপরাংশ ফাঁক হয়ে যায়। এই যুক্তিও সেই রকম। এই যুক্তিতে এক সমস্যা ঘোচাতে গিয়ে যে আরেক সমস্যার সৃষ্টি করছি, সে কথা আমরা ভুলেই যাই। ইংরেজির সাহায্যে ভারতবর্ষের ঐক্যবিধান করতে গিয়ে বাঙালীর ঐক্যকে যে নষ্ট করছি, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে স্বদেশবাসীর সঙ্গে যে বিযুক্ত হচ্ছি, সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। ঈশপের গল্পে যে জ্যোতির্বিদ আকাশের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তারই দুর্দশা যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেকথা ভাববার অবকাশও আমাদের নেই। ইংরেজির উর্ধ্ব গগনে জ্যোতিষ্করাজির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে আমরা যে স্বদেশের নিম্ন-ভূমিতে বিনাশের ভয়ঙ্কর ফাঁকটার দিকেই পা বাড়াচ্ছি, সেদিকে হুঁশ নেই। বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখবার, ভারতবর্ষের ঐক্যবিধানের লোভে স্বদেশ-

বাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনাশলাভের অদ্বিতীয় মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে যাবার জন্য বাঙালীর আবির্ভাব হয়েছে একথা বিশ্বাস করতে পারি না।

বাঙলায় রস-সাহিত্য রচিত হবে মাতৃভাষায়, আর মনন সাহিত্য রচিত হবে বিমাতৃভাষায়, এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ আর কতদিন চলবে? হৃদয় আর মস্তিষ্কের বিচ্ছেদ যে জীবনের পক্ষেই মারাত্মক একথা যেন না ভুলি। মনন সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ না হলে রসসাহিত্যও যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না একথাও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে? গাছের শিকড় যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসার সংগ্রহ করতে না পারে, তবে তার ফলে অমৃতরস যোগাবে কি করে? এটুকু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, আমরা যেন বাঙলার এককক্ষময় অপ্রশস্ত একতলা ঘরের উপরে ইংরেজির বহুকক্ষময় প্রশস্ত দোতালার ঘর নির্মাণের অসাধ্য সাধনেই ব্রতী হয়েছি। রসসাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব বাঙলার, আর ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনন-সাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব ইংরেজির, এই অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘকাল টিকতে পারে না। এই অস্বাভাবিকতার অবসান না ঘটালে বাঙলা সাহিত্যের মুক্তি নেই। আমাদের মহাবিদ্যালয়-সমূহে যেদিন ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত মনন বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলবে মাতৃভাষাতে, সেদিনই বাঙলা সাহিত্যের বহুকক্ষময় প্রশস্ত প্রাসাদ রচিত হবে, সেদিন রসসাহিত্যেরও সুদিন আসবে। পণ্ডিতজনের জন্য উপরের তলার প্রশস্ত ভোজনাগার, আর সাধারণের জন্য নিচের তলার সঙ্কীর্ণ পানীয়-

শালা—এই সর্বনাশা আত্মবিচ্ছেদের অবসানও ঘটবে সেই দিনই।

সেদিন যে সুনিশ্চিতই আসবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।' ভরসার কারণ সেই অনাগত কালের দখিনে হাওয়ার আমেজ এখনই যে মনের মধ্যে অনুভব করছি। সমস্ত দৈন্য সঙ্কীর্ণতার ঝরা-পাতার মধ্যেও আমি বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান ঋতু পরিবর্তনের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' রাজ সরকারের ঔদাসীন্য, শিক্ষানায়কদের নিষ্ক্রিয়তা এবং পণ্ডিত-জনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙলা মনন-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে ইতিমধ্যেই অজস্র মুকুল-মঞ্জরীর আবির্ভাব হয়েছে—

চোখ আছে যার দেখছে সে জন,
অন্ধজনে দেখবে কি ?
ঊষার আগেই আলোর আভাস
সকল চোখে ঠেক্‌বে কি ?

এসব মুকুল-মঞ্জরীর অনেক কিছুই ঝরে যাবে সত্য, কিন্তু এই বসন্তপর্যায় শেষ হ'তে না হ'তেই যে বাঙলা মনন-সাহিত্যের শাখায় শাখায় ফল সম্ভারের আবির্ভাব ঘটবে তা ঋতুচক্র আবর্তনের মতোই ধ্রুব সত্য। আজ যদি বাঙলা সাহিত্যের 'আদমশুমারি' নেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যাবে গত কয়েক

বছরে বাঙলার মনন বিভাগে ছোট বড় যত বই বেরিয়েছে এবং বেরুচ্ছে, এর পূর্বে কোনো কালেই তা হয়নি।

তার কারণ কি? প্রধান কারণ ইংরেজের তিরোধান। ইংরেজের আকর্ষণেই আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজি ভাষার চতুর্দিকে চক্রপথে আবর্তিত হচ্ছিলাম। ইংরেজ আজ তিরোহিত হয়েছে, তার নিত্য আকর্ষণের প্রভাবও শিথিল হয়েছে। ফলে জড়ত্বের নিয়ম অনুসারে আমরা আরও কিছুকাল ওই চক্রপথেই আবর্তিত হব, কিন্তু ক্রমক্ষীয়মান গতিবেগে। এভাবে ইংরেজের টান যে দিন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, সেদিন আমাদের সাহিত্য সমগ্রভাবেই মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে তাকেই প্রদক্ষিণ করতে থাকবে, তাতেই হবে তার সার্থকতা, সেদিনই আসবে সর্বাঙ্গীণ বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, সঙ্গে আসবে আমাদের শিক্ষার সমগ্রতা ও জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ।

তা হ'লে এদেশ থেকে কি ইংরেজির চর্চা একেবারেই উঠে যাবে? তার উত্তর—না, কখনও না। ইংরেজি হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণখনি। যতদিন তার স্বর্ণ ভাণ্ডার নিঃশেষ না হবে, ততদিন আমাদের সুদক্ষ খোদাইকররা তার থেকে অবিরাম স্বর্ণ আহরণ করতে থাকবে। শুধু ইংরেজি কেন, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার খনিতেও আমাদের খোদাইকরদের কাজ চলবে অবিশ্রান্তভাবে। সে সোনা শোধন করে তাঁরা দেবেন আমাদের স্বর্ণকারদের হাতে। সেই স্বর্ণকাররা তার থেকে বহু বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার রচনা করে পরাবেন আমাদের মাতৃভাষাকে। সেই সুদিনকেই আমি বলছি বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

তবে এতদিন আমরা কি করেছি? এতদিন আমরা সবাই মিলে ইংরেজির সোনার খনিতে সেঁধিয়ে কেবলই অশোধিত সোনা সংগ্রহ করেছি এবং পরস্পরের গায়ে ছোঁড়াছুড়ি করেছি। কেউ কেউ যে ঐ সোনা দিয়ে অলঙ্কার গড়ার কাজেও মন দেয়নি, তা নয়। যাঁরা সেদিকে মন দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকা ই শ্বেতাঙ্গী বিমাতার দেহলাবণ্যকেই বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করবার ব্যর্থ সাধনাতেই জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু সেই শ্বেতভূজা কৃষ্ণ হস্তের সেই পূজার্ঘ্যকে ক্ষণিক হাস্যে গ্রহণ করলেও তাকে নিত্যকালের অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখেননি। তা ছাড়া মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্র প্রমুখ আর কয়েকজন সামান্য কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার রচনা করে ভক্তিনম্র করে শ্যামাঙ্গী দীনা মাতৃভাষার রিক্ত কণ্ঠেই পরিয়েছেন, সেই দরিদ্র সন্তানের ভক্তি-অর্ঘ্যকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে গ্রহণ করে তাকে নিত্যকালের রত্নাধারেই সঞ্চয় তিনি করে রেখেছেন। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে মায়ের সেই ভক্ত সন্তান ক'টি

'কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়,
সে যে আমার জননীরে।'

এই বেদনা-সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে শুধু অশ্রুজলের মুক্তা হারেই মায়ের শ্যামাঙ্গ ভূষিত করে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঙলা মায়ের অধিকাংশ সাবালক সন্তানই ইংরেজির স্বর্ণ খনিতে প্রবেশাধিকার পেয়ে ও অমার্জিত বিদেশী সোনা নিয়ে নাড়া-চাড়া করবার সুযোগ পেয়ে খনির সেই অন্ধকার গহ্বরকেই

আমাদের চিরকালের আশ্রয়স্থল বলে সগর্বে স্বীকার করে নিয়েছেন। বার বার মায়ের আহ্বান শুনেও রৌদ্রালোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার আশঙ্কাতে ওই মোহান্ধকারের বাইরে আসতে তাঁদের চরণ দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু কাল বসে নেই। ওদিকে খনির বাইরে মাতৃভাষার অমানিশার শেষে নব প্রভাতের সোনার আলোতে আহ্বানগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি, হায় হায় হায়।

আজ মাতৃভাষার অঙ্গনে বিগত রজনীর অন্ধকার কেটে গিয়ে নব প্রভাতের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই শুভ মুহূর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বিদেশী খনির তিমির গর্ভ থেকে এবং নব-যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নূতন উষাকে অভিনন্দিত করে সমবেত কণ্ঠে গাইতে হবে—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।